শিল্পীসপ্তক

কমল সরকার

অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

দীর্ঘ দিন থেকে ভারতের ভাস্কর ও শিল্পীদের নিয়ে এক গ্রন্থ রচনার কাজে লিপ্ত থাকার ফলে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে এদেশে ললিতকলা অনুশীলনের যে ক্রমোৎকর্ষ তা জানার সুযোগ হয়েছে। উল্লিখিত 'ভারতের ভাস্কর ও শিল্পী' গ্রন্থটির কাজ চলাকালেই সাময়িকপত্রে কয়েকজন শিল্পী ও ভাস্কর সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পরিবেশন করি। কারণ, মূল গ্রন্থটি হবে এনসাই-ক্লোপিডিয়া ধর্মী তথ্যপূর্ণ রচনার সমষ্টি। অথচ গবেষণালব্ধ শিল্পী ও ভাস্করদের অনেকেরই জীবন ঘটনাবহুল এবং এঁদের কয়েকজন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। এঁদের কোন কোন শিল্পী আবার পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও যথোপযুক্ত গবেষণার অভাবে বিস্মরণের বলি হয়েছেন। এমন শিল্পী ভাস্করদের যে সাতজনকে নিয়ে নিবন্ধগুলি রচিত হয়েছে তাঁর প্রথমটি এক ইংরেজ অধ্যক্ষের। অগ্রণী ইংরেজ অধ্যক্ষ হেনরি হোভার লক-এর জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়েই জানা যাবে এদেশের ললিতকলা চর্চার আদিপর্বের ইতিবৃত্ত।

অপর ছটি রচনার মাধ্যমে একে একে তুলে ধরা হয়েছে ললিতকলার এমন কয়েকজন প্রতিভাবান প্রতিনিধিকে যেগুলির মাধ্যমে আলোচ্য শিল্পীদের ব্যক্তিগত রচনানৈপুণ্যের সমীক্ষাই নয়, বিগত শতবর্ষের ললিতকলা আন্দোলনের বিবিধ বিষয়ের নির্ভর-যোগ্য সূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাবে।

একমাত্র অতুল বসু সম্পর্কিত রচনাটি ছাড়া এ গ্রন্থের সব কটি প্রবন্ধই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থ সেই রচনাগুলিরই সঙ্কলন। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে এগুলির পরিবর্ধন করা হয়েছে।

ললিতকলায় বাংলার যে ঐতিহ্য সে তুলনায় বাংলাভাষায় ললিতকলা সম্পর্কিত গ্রন্থের বড় অভাব। সেদিক থেকে এ গ্রন্থটি যদি আংশিক অভাবও পূরণ করে তবে পরিশ্রম সার্থক হলো বলে মনে করব। এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্রকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হেনরি হোভার লক এবং 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' গ্রন্থের আখ্যাপত্রের আলোকচিত্র ন্যাশনাল লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত হরিশ্চন্দ্র হালদারের মুখচ্ছবিটি রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত। এ পর্যায়ের রাজর্ষির চিত্র এবং শশিকুমার হেশের আলোকচিত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গৃহীত। শশিকুমার হেশ অঙ্কিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর চিত্রটি ন্যাশনাল লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রমথনাথ মল্লিক এবং তাঁর রচিত ভাস্কর্যের আলোকচিত্র তাঁরই সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অতুল বসু এবং হেনরিয়েটার চিত্রের আলোকচিত্র দুটি শ্রীপার্থ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত। এ অধ্যায়ের আরও দুটি আলোকচিত্র শ্রীযুক্তা দেবযানী বসুর সৌজন্যে মুদ্রিত হলো।

সূচী

চিত্রসূচী

হেনরি হোভার লক

অগ্রণী চারুকলা শিক্ষক

প্রখর রৌদ্রে কলা-সমালোচক এক বন্ধুকে নিয়ে যেদিন লোয়ার সার্কুলার রোড সেমিট্রিতে গিয়ে পৌঁছুলাম সেদিন তিনিও বিশ্বাস করতে পারেননি যে অনতি-বিলম্বেই দেখতে পাব আমাদের অবহেলা আর ঔদাসীন্যের এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন। খুঁজে পাব কলকাতার আদিতম চারুকলা শিক্ষায়তনের প্রথম প্রিন্সিপাল হেনরি হোভার লকের সমাধি।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্রের নির্জনতা ভেঙে দিলেন বন্ধুটি নিজেই। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে পড়ে গেলেন তিনি—"ইন লাভিং মেমোরি অব হেনরি হোভার লক···হি গিভেথ হিজ বিলাভেড স্লিপ।" সমাধিস্তম্ভের প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ কথাগুলি ক্ষণিকের জন্যে ফিরিয়ে দিল আধুনিককালের ললিতকলা চর্চার ভুলে-যাওয়া প্রথম প্রভাত।

প্রায় শতবর্ষ আগে সমাহিত হেনরি লকের হারিয়ে-যাওয়া সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমরা অপরাধী। বিস্মৃতি আর ঔদাসীন্যের অপরাধে অপরাধী নির্বাক আমাদের মাথা আপনিই নীচু হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সেদিন, সেই মুহূর্তে, যে অনুভূতি বার বার মনকে পীড়িত করে তুলছিল তা হলো হেনরি লকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর কেউ নেই আজ। তাঁর পরিচালিত শিক্ষায়তন শতায়ুর সীমা অতিক্রম করলেও তাঁর প্রথম আচার্যের সমাধিস্থল আজও অজ্ঞাত। কোন ফুল, কোন তিলাঞ্জলির আয়োজন সেখানে আজ অচিন্তনীয়।

২

উনিশ শতকে শিক্ষায়তনের পরিবেশে চারুকলা অনুশীলনের যে সূচনা তার আদিপর্বের যাঁরা শিক্ষাদাতা তাঁরা সবাই ছিলেন বিদেশী। সেই বিদেশী শিক্ষা-ব্রতীদের অনেকেই জীবনের দীর্ঘতম সময় এ-দেশেই অতিবাহিত করেন। জীবিকার প্রয়োজনে এসে এঁদের কেউ কেউ জীবনদানও করে গিয়েছেন এদেশে। এমন উৎসর্গিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল হেনরি হোভার লক।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এদেশে চারুকলা অনুশীলনের সূচনা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। মাদ্রাজের ইংরেজ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ডাঃ আলেকজাণ্ডার হাণ্টার ভারতের প্রথম চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে কলকাতা, বোম্বাই এবং জয়পুরে তিনটি চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা এ-বিষয়ে দ্বিতীয় এবং কলকাতার চারু-কলা বিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। বিদ্যালয়টির তখন নাম ছিল 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। কর্নেল গুডউইন, হজসন প্র্যাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড লং, সিসিল বিডন, ডাক্তার সূর্যকুমার

গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ আরও কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজের প্রচেষ্টায় কলকাতার এই বেসরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

মুখ্যত ললিতকলার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন লেফট্যানেণ্ট—গভর্নর স্যার সিসিল বিডন-এর উদ্যোগে এই বেসরকারী শিক্ষায়তনটির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক ভার গ্রহণের সময় 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি ইংল্যাণ্ডের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের কাছে কলকাতার এই চারুকলা শিক্ষায়তনের জন্য একজন প্রিন্সিপাল চেয়ে পাঠান। কলকাতার অনুরোধের উত্তরে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের অধীন 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব ডিজাইন' থেকে যাঁকে প্রিন্সিপাল মনোনীত করা হয় তিনিই হেনরি হোভার লক।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ ইংল্যাণ্ডে হেনরি হোভার লকের জন্ম। লণ্ডনের নিকটবর্তী সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে অবস্থিত 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব ডিজাইন'-এ তাঁর চারুকলা অনুশীলন। সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনে লকের সহ-পাঠীদের মধ্যে যাঁরা চারুকলার শিক্ষক হয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জন লকউড কিপলিং এবং জন গ্রিফিথস সুপরিচিত।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে চারুকলার শিক্ষক হয়ে যিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন তিনিই হেনরি হোভার লক। হেনরি লকের পরে দ্বিতীয় যে শিক্ষককে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম ভারতে পাঠিয়েছিলেন তিনি জন লকউড কিপলিং। জন লকউড কিপলিং বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ক ভাস্কর্যের শিক্ষকরূপে ভারতে আসেন (১১ মে, ১৮৬৫)। প্রায় দশ বছর পর তিনি লাহোরের নব প্রতিষ্ঠিত মেয়ো স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (২৪ এপ্রিল, ১৮৭৫)। বিশ্ববিশ্রুত কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁরই পুত্র এবং জন লকউডের বোম্বাই অবস্থানকালেই রুডইয়ার্ডের জন্ম হয় বোম্বাইতে (১৮৬৫)।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে প্রেরিত তৃতীয় শিক্ষক জন গ্রিফিথস। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন তাঁর কর্মভার গ্রহণ। তিনিও বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বে আর্ট সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তাঁর আঁকা অজন্তার চিত্রাবলী বোম্বাইতেই বোম্বে আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই চিত্রগুলি উনিশ শতকেই গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়েছিল।

ভারত-চিত্রকলার প্রখ্যাতনামা ভাষ্যকার, অনুরাগী, প্রবক্তা এবং অবনীন্দ্রনাথের 'গুরু' আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলও এই সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে মনোনীত হয়ে প্রথম ভারতে আসেন। তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড কিম্বার্লি কর্তৃক

হেনরি হোভার লক

(১৮৩৭—১৮৮৫)

ও

আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি

শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী

প্রণীত।

কলিকাতা।

FINE ARTS OF ANCIENT INDIA.

WITH

A SHORT SKETCH OF THE ORIGIN OF ART.

BY

SYAMA CHARANA SRIMANI

মনোনীত হয়ে হ্যাভেলের মাদ্রাজে আগমন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে প্রেরিত চারুকলা শিক্ষকদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে আসার জন্য মনোনীত হবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর লণ্ডনের 'টাইমস' সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। হ্যাভেলের নিয়োগ সম্পর্কিত টাইমস-এর সে সংবাদ উদ্ধারযোগ্য ঃ

"Lord Kımberly has just appointed Mr. Havell, of the Science and Art Department at South Kensington, to the Superintendentship of the Madras School of Art. Mr. Havell's is the fourth appointment of this kind that has been made from South Kensington."

হ্যাভেলের ভাস্কর্য ও চারুকলা শিক্ষাও ঐ গভর্নমেণ্ট স্কুল অব ডিজাইনে। অবশ্য হ্যাভেলের যখন ললিতকলা অনুশীলন তখন সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের স্কুল অব ডিজাইনের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'। তাই হ্যাভেল এ আর সি এ অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট অব দি রয়্যাল কলেজ অব আর্ট। মাদ্রাজে আগমনের প্রায় বারো বছর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হ্যাভেল কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৩

সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনে ছাত্র থাকাকালে হেনরি লক এক ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেই ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় হাউস অব কমন্স থেকে এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়। অতঃপর কেনসিংটন মিউজিয়ামের পরিচালক স্যার হেনরি কোল-এর মধ্যস্থতায় ছাত্র আন্দোলনের অবসান।

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কৃতী ছাত্ররূপে হেনরি লক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন ছিলেন। তদানীন্তন বাংলা সরকার-গঠিত কমিটি যখন স্কুল অব ডিজাইনের কাছে প্রিন্সিপাল প্রেরণের অনুরোধ জানায় তখন গভর্নমেণ্ট স্কুল অব ডিজাইন হেনরি লককেই মনোনীত করেন। লকের ছাত্রজীবনের কথা কলকাতার 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় তাঁর পরলোকগমনের পর। দৈনিক 'ইংলিশম্যান'-এর সে সংবাদে বলা হয়েছিল (২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫) ঃ

"One of the reminiscences of his student days was a revolt against the authority of the School, which attracted considerable attention at the time. A committee of the House of Commons inquired into the matter, but, mainly through the tact of the late Sir Henry Cole, the affair was tied over without serious consequences to anyone. Although Mr. Locke had taken an active part in the mutiny, he was recommended by South Kensington for the post of Principal of the Calcutta School of Art, to which he was duly appointed."

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে হেনরি লক কলকাতার স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর প্রথম প্রিন্সিপালরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। লকের যোগ-দানের পর শিক্ষায়তনের নাম হয় গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট। হেনরি লকের পরিচালিত এই চারুকলা বিদ্যালয়ই আজকের 'গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট'। হেনরি লক সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর অধ্যক্ষরূপে জড়িত ছিলেন। উনিশ শতকের বহু কৃতী শিল্পীর অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-তান্ত্রিক শিক্ষার প্রবর্তন তিনিই করেন। তাঁরই উদ্যোগে একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় পাঠ্যসূচী। শ্যামাচরণ শ্রীমানী, অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও আর বি লসন প্রমুখ কৃতী ছাত্রকে তিনিই প্রথম বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।

উনিশ শতকের বহু সাড়া জাগানো গ্রন্থে, নানা ঐতিহাসিক গৃহ ও উপাসনা মন্দিরে এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একাধিক গবেষণামূলক কাজে লকের ছাত্রদের শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আজও বর্তমান।

লকের নেতৃত্বে সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের সর্বাধিক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত সেণ্ট পিটার্স চার্চের অলংকরণ। ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে অবস্থিত সেণ্ট পিটার্স চার্চটির আভ্যন্তরীণ অলংকরণ এবং ফ্রেস্কো রচনার কাজে লক সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করেন। আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের উদ্দেশ্যেই তাঁর এ কাজ গ্রহণ। তাঁর এদেশে আগমনের এক বছরের মধ্যেই ছাত্রেরা এ কাজ সম্পন্ন করেন।

পরবর্তী সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যও লকের ছাত্রেরা কাজ গ্রহণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রদর্শশালার জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষের আবক্ষ মূর্তি এবং জন্তু-জানোয়ারের দেহের অংশ রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অধ্যক্ষ লক এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ এবং ছাত্রদের মধ্যে তা সমভাবে বণ্টন করেন।

১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকারের অনুরোধে পুরাতত্ত্ববিদ ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওড়িশার প্রাচীন স্থাপত্য ও শিল্পকলার এক সমীক্ষা করেন। ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি মন্দির, স্তূপ, গুহা, শিলালেখ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তার সেই সমীক্ষার ফলশ্রুতি 'অ্যাণ্টিকুইটিস অব ওড়িশা' নামের দুটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ দুটি মুদ্রণের জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার সাড়ে সাত হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলালের এ-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অ্যাণ্টিকুইটিস অব ওড়িশা-র প্রথম খণ্ডে ৩৬টি লিথোগ্রাফ এবং ৫০টি কাঠখোদাই চিত্র আছে এবং এ-গ্রন্থের চিত্রগুলির নেপথ্যে রয়েছেন হেনরি লকের একাধিক কৃতী ছাত্র।

ওড়িশা ভ্রমণের আগেই রাজেন্দ্রলাল ঠিক করেছিলেন যে তাঁর এ গ্রন্থ সচিত্র হবে। মন্দির, চৈত্য, গুহা ও স্তূপের সম্ভাব্য সমস্ত নিদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত হবে এবং সে চিত্রগুলি অঙ্কনের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের সেই সাড়া জাগানো গ্রন্থ রচনায় হেনরি লকের অবদান অসামান্য। তাঁরই নির্দেশে সরকারী আর্ট স্কুলের কয়েকজন ছাত্র প্রধান শিক্ষক ডি গ্যারিকের নেতৃত্বে একাধিকবার ওড়িশা ভ্রমণ

ওচিত্র অঙ্কন করেন। রাজেন্দ্রলালের এ-গ্রন্থের দুটি খণ্ডেই হেনরি লকের ছাত্র অন্নদা-প্রসাদ বাগচী, গোপালচন্দ্র পাল, কালিদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র খাঁ, উদয়চাঁদ সামন্ত প্রমুখ শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।

রাজেন্দ্রলাল হেনরি লকের এই অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন 'অ্যাণ্টি-কুইটিস অব ওড়িশা'-র মুখবন্ধে। লকের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন ঃ

"In the course of compiling this work I have derived assistance from several gentlemen, to whom I wish to avail myself of the present opportunity publicly to tender my thanks. H. H. Locke, Esq., Principal of the Calcutta School of Art, has helped me most materially in a variety of ways. When I was proceeding of my tour, he placed at my disposal the services of one of his best pupils, Annadaprasad Bagchi, who accompanied me to Orissa, and took sketches and plans of a large number of interesting objects."

রাজেন্দ্রলালের 'অ্যাণ্টিকুইটিস অব ওড়িশা' রচনার অন্তর্বর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'দি থ্যানাটোফিডিয়া অব ইণ্ডিয়া ঃ বিইং এ ডেসক্রিপশান অব দি ভেনোমাস স্নেকস অব দি ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা'। উনিশ শতকের কলকাতার প্রথিতযশা ইউরোপীয় শল্যচিকিৎসক ডাঃ যোশেফ ফেরার-এর ভারতীয় বিষধর সর্প সম্পর্কিত সচিত্র এই গ্রন্থটি বিগত শতকের মুদ্রণচাতুর্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বড়লাট লর্ড মেয়োকে উৎসর্গ করা হয়। বৃহৎ আকারের এ গ্রন্থে সর্পকুলের ২৯টি প্লেটের শিল্পী হেনরি লকের ছাত্রেরা। ডাঃ ফেরার-এর এই অকল্পনীয় গ্রন্থের রূপদানের জন্য তিনি হেনরি লকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা ভারতীয় সর্পের রূপদান অসম্ভব, একথা মনে রেখেই তিনি হেনরি লকের কাছে গিয়েছিলেন। শল্যচিকিৎসক ডাঃ ফেরার-এর অনুরোধে তাঁর শিল্পীবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নিযুক্ত করেন এ কাজে। দি থ্যানা-টোফিডিয়া অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের সমস্ত চিত্রগুলি অঙ্কন ও তার লিথোগ্রাফ করেন অন্নদা-প্রসাদ বাগচী, হরিশ্চন্দ্র খাঁ, নিত্যানন্দ দে ও বিহারীলাল দাস। লকের নির্দেশে সাপুড়েদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল নানা বিষধর সাপ এবং জীবন্ত সাপ দেখে আঁকা হয়েছিল এই স্মরণীয় গ্রন্থের অধিকাংশ চিত্র।

৪

লক নিজেও ছিলেন চিত্রশিল্পী। কিন্তু একটি মাত্র কাজ ছাড়া আজ তাঁর চারু-কলা চর্চার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। লকেরই কয়েকজন ছাত্র বিগত শতকে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে চারুকলার এক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম চারুকলার সাময়িক। ১২৯২ বঙ্গাব্দের (১৮৮৫) আষাঢ় মাসে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'র আত্মপ্রকাশ কলকাতায়। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শরচ্চন্দ্র দেব,

কালিদাস পাল, বিহারীলাল রায়, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষকেরা পত্রিকাটির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় লিখিত আছে যে, গভর্নমেণ্ট হাউস অর্থাৎ বর্তমান রাজভবনের একটি হলঘরের সিলিং-এ যে অলংকরণ আছে তার শিল্পী হেনরি লক।

দীর্ঘদিন পরে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড কার্জন রচিত 'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' (১৯২৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'র মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণের পরই লক তদানীন্তন গভর্নমেণ্ট হাউসের মার্বেল হল-এর সিলিং অলংকরণের কাজ গ্রহণ করেন। উই পোকার আক্রমণের জন্য সে সময় মার্বেল হলের সিলিং-এর কাঠের অংশগুলি বর্জন করা হয়। নতুন কাঠের সিলিং ব্যবহারের সময় ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স লককে অলংকরণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। পরিণামে লকের এ কাজ গ্রহণ।

লকের এই একটিমাত্র কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পরলোকগমনের বহু পরে লর্ড কার্জন তাঁর 'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"It was not till Sir John Lawrence came in 1865 that the present coffered wooden ceiling was substituted for it. I believe that the present designs in white and gold were the work of Mr. H. H. Locke, formerly Principal of the Calcutta School of Art."

৫

শিক্ষকতা ছাড়াও চারুকলা সম্পর্কিত নানা স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলির পর্যালোচনায় লকের সংগঠনশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। এ চিত্রপ্রদর্শনীর নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট একজিবিশান'। ভাইসরয় লর্ড মেয়োর পৃষ্ঠপোষকতায় ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে (অধুনা বিলুপ্ত) অনুষ্ঠিত সে প্রদর্শনীর সঙ্গে হেনরি লকের কোন সম্পর্ক ছিল কি না তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। যদিও লক সে সময়ে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তবুও এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন সংবাদেই তাঁর নামোল্লেখ নেই। তবে আর্ট স্কুলের ছাত্রেরা যে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। লকেরই ছাত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের তৈলচিত্র 'স্পিরিটেড গ্রুপ অব হর্সেস' এই প্রথম প্রদর্শনীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা উল্লেখযোগ্য।

ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় শিল্পীরাই ছিলেন এই প্রদর্শনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিযোগী। প্রদর্শনীর সব পুরস্কারের প্রাপকও ছিলেন তাঁরা। ইউরোপীয় শিল্পীদের

প্রাধান্য-প্রভাবিত সেই প্রদর্শনীতে শৌখীন শিল্পী দেবেন্দ্র মল্লিকের চিত্র ভাইসরয় এবং প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি হিউ স্যানডেম্যানের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের এই স্মরণীয় চিত্রটি মার্বেল প্যালেসে রক্ষিত আছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট একজিবিশান' অনুষ্ঠিত হয় তিন বছর পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের লাল বাড়িতে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এ প্রদর্শনীর সংগঠনের মূলে ছিলেন হেনরি লক। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর তিনি অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং জয়পুরের আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্পকর্ম ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পকলার সঙ্গে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবার কাছে। জল ও তেলরঙে আঁকা ছাত্রদের নানা চিত্রের শিল্প-নৈপুণ্য স্বীকৃত হয় ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের ভাষণে। এই প্রদর্শনীতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র খাঁ এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নাম উল্লেখ করে রিচার্ড টেম্পল প্রিন্সিপাল লককে অভিনন্দন জানান। কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই মৃন্ময়মূর্তি রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

কলকাতার এই দ্বিতীয় সরকারী প্রদর্শনী অপর একদিক থেকে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। কারণ, এই প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটনের সময় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কলকাতায় স্থায়ী একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ঘোষণা করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল বৈঠকখানা-বউবাজারে আর্ট স্কুলের নতুন বাড়িতে বড়লাট নর্থব্রুক কলকাতা তথা ভারতের প্রথম পাবলিক গ্যালারি অব আর্ট-এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। গ্যালারির প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ কীপার নিযুক্ত হন হেনরি লক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে পটলডাঙ্গা অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের কাছে অবস্থিত বাড়ি থেকে বউবাজারের নতুন বাড়িতে উঠে আসে আর্ট স্কুল। আর্ট গ্যালারির উদ্বোধনের সঙ্গে নতুন বাড়িতে আর্ট স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন বড়লাট নর্থব্রুক।

হেনরি লকের সাংগঠনিক উদ্যোগের অন্যতম দৃষ্টান্ত কলকাতার তৃতীয় সরকারী প্রদর্শনী। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আর্ট স্কুলের বউবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই চিত্র প্রদর্শনীর দুজন অবৈতনিক সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন হেনরি লক। অপরজন হার্বার্ট হোপ রিজলি। বড়লাট লর্ড লিটন তৃতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

তৃতীয় প্রদর্শনীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই প্রদর্শনীতে প্রথম একজন ভারতীয় শিল্পী সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ভাইসরয়স প্রাইজ'-এ সম্মানিত হন। বোম্বাইয়ের পার্শি শিল্পী পেস্টনজি বোমানজি তাঁর 'হেড অব এ গোসাই' প্রতিকৃতি চিত্রটির

জন্য বড়লাটপ্রদত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন। ইউরোপীয় শিল্পীদের গতানুগতিক-ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তির অবসান এই তৃতীয় প্রদর্শনীতে।

হেনরি লকের ছাত্রদের এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে সে যুগের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (৭ জানুয়ারি, ১৮৭৯) লেখা হয়ঃ

"গভর্নমেন্টের শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ৩০খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ১৬খানি দেশীয় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র আছে। তন্মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে ২, বোম্বাই হইতে ১ এবং বাকি বাংলা হইতে প্রদত্ত।"

সরকারী আর্ট স্কুলের একাধিক ছাত্রও এই প্রদর্শনীতে নানা পুরস্কারে সম্মানিত হন। পরবর্তী যুগের যশস্বী প্রতিকৃতিশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তৃতীয় প্রদর্শনীতেই আত্মপ্রকাশ। হেনরি লকের কৃতী ছাত্র বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তৈলাঙ্কিত 'জাগলার অ্যাণ্ড মংকি' চিত্রটির জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। মতিলাল পাল, নবকুমার বিশ্বাস এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমুখ ছাত্র এই প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন।

৬

বিবিধ স্মরণীয় প্রদর্শনী, বহু সংস্থা ও চিত্রকলা আন্দোলনের অগ্রদূত হেনরি লক সে যুগে 'মহাত্মা'-রূপে পরিচিত ছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও তাঁকে ঐ সম্মানে অভিহিত করেছেন বহুবার।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় এই আন্দোলনের প্রথম যুগে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও হেনরি লকের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন।

হ্যাভেলের ভারতে আসার বহু আগে হেনরি লকই প্রাচীন ভারতের শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজকে সচেতন করেন। লকের পরলোকগমনের বহু পরে অবনীন্দ্রনাথ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য প্রীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেনঃ

"কিন্তু হায় তাঁহার আশা কতদূর সফল হইল। সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া যে মহাত্মা আমাদের শিল্প-শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সেই মহৎ আশা আমরা কতদূর পূর্ণ করিলাম।"

সরকারী আর্ট স্কুলের জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' গ্রন্থকে উপলক্ষ করে অবনীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য। নাট্যকার ও কবি শ্যামাচরণ শ্রীমানীর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার প্রথম শিল্প ও চারুকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ তাঁর এই গ্রন্থে ভারতের দেব-দেউল, গুহা, স্তূপ প্রভৃতির নির্মাণরীতি অর্থাৎ স্থাপত্য-বিদ্যা এবং ভাস্কর্য, গুহাচিত্র ও চিত্রবিদ্যার প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

করেন। লকের অধীনে সরকারী আর্ট স্কুলেই শ্যামাচরণের চিত্রবিদ্যা অনুশীলন। সেহেতু তিনি 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' গ্রন্থটি হেনরি লককেই উৎসর্গ করেন।

· গ্রন্থ প্রাপ্তির পর শ্যামাচরণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে হেনরি লক যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা শ্যামাচরণের গ্রন্থে সংযোজিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী আর্ট স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে ভাষণদানকালে অবনীন্দ্রনাথ শ্যামাচরণের গ্রন্থে যুক্ত মহাত্মা হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য প্রীতির উল্লেখ করেন।

শ্যামাচরণকে লিখিত হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার এক অনুবাদও করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্পপ্রীতির এক স্মরণীয় দলিল। অতএব অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হল ঃ

"প্রিয় শ্যামবাবু—তোমার উপহৃত পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম—আর্যজাতির শিল্প-চাতুরী সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, যে সুযোগ, তত্ত্বানুসন্ধান এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এ পর্যন্ত তোমার স্বদেশীয়গণের নিকট সুপ্রাপ্য ছিল না, এবং সেই কারণেই বঙ্গবাসীগণ একদিকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পথে যেমন অধ্যবসায় এবং প্রশংসার সহিত অগ্রসর হইতেছেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পচর্চা সম্বন্ধে একেবারে মনোযোগ দিতেছেন না। ভারতের পুরাতন শিল্পকলার সম্যক্ চর্চা করিতে হইলে যে অবকাশ এবং সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজন, আমি জানি, তাহা তোমার নাই ; তথাপি তুমি তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তাঁহাদের মাতৃভাষায় তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার জন্য এই যে পুস্তক রচনা করিয়াছ, ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের বহুল প্রচারেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট তোমার এই স্বল্প চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।"[১]

৭

হেনরি লকের শেষ জীবন বেদনাদায়ক। সরকারী প্রশাসনের হৃদয়হীন আচরণ তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনের কোন মূল্যায়ন সেদিন করেনি। তাঁর দুই দশকের কর্মজীবনের সমাপ্তির কারণ যেমন অজ্ঞাত তেমনি অদ্ভুত। অবসর গ্রহণের আগেই সরকারী নির্দেশে তিনি বাধ্যতামূলক ছুটি নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বাধ্যতামূলক ছুটির মাধ্যমেই তিনি অপসারিত হন এবং তাঁর অপসারণের মূলে তাঁরই পরিচালিত অপর এক প্রতিষ্ঠান—'ইকনমিক মিউজিয়াম'।

লেফট্যানেন্ট-গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের উদ্যোগে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংস স্ট্রীটে ইকনমিক মিউজিয়াম নামে ভূমিজাত দ্রব্যের শিল্প এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ক এক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল হেনরি লককে এই সংগ্রহশালার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতার সঙ্গে তিনি এই

---

১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর', জাহ্নবী ; বৈশাখ ১৩১৩।

মিউজিয়ামের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ ইকনমিক মিউজিয়ামের পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ইকনমিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পরে নিউ সাউথ ওয়েলস নিবাসী জনৈক জুলে জোবার্টের পরিকল্পনায় ভারত সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম এক ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বড়লাট লর্ড রিপন মিউজিয়ামের সামনে ময়দানে এই বৃহৎ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রস্তুতি-পর্বে ইকনমিক মিউজিয়ামের সভাপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ এবং সম্পাদক হেনরি লকের মধ্যে অজ্ঞাত এক বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তাঁদের মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করায় তৎকালীন ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন হেনরি লককে বিচারপতি প্রিন্সেপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেন। কিন্তু লক ছোটলাটের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই কারণে তিনি ছোটলাট অ্যাশলির বিরাগভাজন হন এবং সরকারী নির্দেশে অসুস্থতা হেতু তাঁর দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

প্রায় দু বছর তিন মাস পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অসুস্থ অবস্থায় লকের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে দেওয়া হলেও ইকনমিক মিউজিয়ামের সম্পাদকের পদ তিনি ফিরে পান নি। অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় এক বছর পাঁচ মাস অধ্যক্ষতার পর কলকাতাতেই তাঁর পরলোকগমন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের আগের দিন চৌরঙ্গী এলাকার ওয়াটারলু হোটেলে এক যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান সভায় তিনি যোগ দেন এবং ঐ হোটেলেই মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে হৃদরোগে ২৪ ডিসেম্বর তাঁর পরলোকগমন। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ লোয়ার সার্কুলার রোড সেমিট্রিতে সমাহিত করা হয়।

হেনরি লকের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে চারুকলা অনুরাগী প্রতিটি মানুষই সেদিন মর্মাহত হয়েছিলেন। নানা সংবাদপত্রে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয় শোকাভিভূত চারুকলা অনুরাগীদের মর্মবেদনা।

১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৯ পৌষ 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রে লকের পরলোকগমনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা তাঁর কর্মজীবনের এক সমীক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে। লক্ষণীয় লকের জীবন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিরও সমালোচনা করে 'সঞ্জীবনী' এবং এ সমালোচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে হেনরি লকের মহত্ত্ব ও অবদান। সেহেতু 'সঞ্জীবনী'-র সে রচনা উদ্ধার করা হলো ঃ

"...মিঃ লক লাহোর শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মিঃ কিপলিং ও বোম্বাই শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রিফিথসের সহিত বিলাতের কেনসিংটন কলেজে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের বিশেষ অনুরোধেই তিনি প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পদে অভিষিক্ত হন।...

কিন্তু লকের মেজাজ বড় ভাল ছিল না। বিচক্ষণ কার্যপটু ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়াও সামান্য ত্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিত, সেই জন্য তাঁহার নামে একটু কলঙ্ক পড়িয়াছে। এই অপরিহার্য ক্রোধের হাত এড়াইতে না পারিয়াই… সভাপতি জস্টিস প্রিন্সেপ সাহেবের সহিত সাধারণের অজানিত কোন এক বিষয় লইয়া লকের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ ঘনীভূত হইয়া মেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বিবাদের সময় লক অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন—পীড়িতাবস্থায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি সভাপতির নিকট অবনত হইতে পারিলেন না।…এই সময়ে ইডেন সাহেব বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন। তিনি নিজে প্রদর্শনী সম্বন্ধে লকের ন্যায় একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মেলা ভার এমন সকল উচ্চ দরের কথা লিখিয়া লক সাহেবকে বিবাদ মিটাইবার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন। কিন্তু তত্রাচও লকের অটল প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হইল না। তিনি রাজপুরুষদিগের ক্রোধে পড়িয়া মিউজিয়ামের কর্ম হইতে কলেকৌশলে অপসৃত হইবার জন্য বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের বিশেষ পীড়াপীড়িতে ২॥০ বৎসর ফার্লো লইয়া বিলাত গমন করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর মিউ-জিয়ামের কর্ম পাইলেন না।…

অনেকেই তাঁহার ঔদ্ধত্য ও খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা শুদ্ধ নিন্দায় কর্ণপাত করি না। আমরা বেশ জানি তিনি গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন, কেবল অকর্মণ্যের পক্ষে ত্রাসস্বরূপ ছিলেন। কোন ভাল ছাত্র বা তাঁহার অধীনস্থ সুদক্ষ কর্মচারীগণ কখনও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন নাই।"

বাংলা পত্র-পত্রিকার মত সে যুগের প্রায় সব ইংরেজি সংবাদপত্রেই লকের পরলোকগমনে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয় এবং এ শোকসংবাদগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অবদান। বিগত যুগের দৈনিক 'ইংলিশম্যান' থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রদ্ধার্ঘ্য উদ্ধৃত করা হলো (২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫):

"The sudden death of Mr H. H. Locke, Principal of the School of Art, Calcutta, will be a painful shock to his many friends. Mr. Locke had been in different health for some time past, but he had not been complaining recently of any accession of suffering, and his death occurred on Christmas eve with s art-ling suddenness... On the establishment of the Bengal Economic Museum, he was appointed Secretary by Sir George Campbell... Mr. Locke was an artist of great ability and refinement, and it would be difficult to estimate the services which he rendered to art in India during his twenty years of office. He might have done more in the way of original work had his health been better and his judgement less exacting, but whatever he set his hand to bore the evidence of artistic skill and sound training."

আটচল্লিশ বছর বয়সে লকের পরলোকগমন নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। সরকারী আর্ট স্কুলের কর্ণধাররূপে মৃত্যুর দুই দশক আগে যখন তাঁর কর্মভার গ্রহণ তখন এদেশে চারুকলা চর্চা অসার্থক এবং অপদার্থ মানুষের জীবিকা রূপেই পরিগণিত হত। স্বভাবতই চারুকলার প্রতি সেযুগের শিক্ষিত মানুষের ছিল গভীর অনীহা। দুই দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ললিতকলার প্রতি বাঙ্গালী সমাজের অনাসক্ত মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে সফল হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এ সাফল্যের স্বাক্ষর নিহিত রয়েছে সরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিটি বাৎসরিক প্রতিবেদনে। সে প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেনরি লকের যখন এই শিক্ষায়তনে যোগদান তখন সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর পর যেদিন তাঁর পরলোকগমন সেদিন সরকারী আর্ট স্কুলে ১৩৯ জন শিক্ষার্থীর কল-কোলাহল।

৮

উনিশ শতকে এদেশে চারুকলা আন্দোলনের যে ক্রমপ্রসার তা হেনরি লকের শিক্ষা ও পরিচালনারই ফলশ্রুতি। এ ফলশ্রুতির সীমা শিক্ষায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তারও সূচনা লকের শিক্ষকতাকালেই সম্ভব হয়।

লকের ছাত্র ও সহযোগী শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানীর নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম মনে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শ্যামাচরণ শ্রীমানীই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রাচীন ভারতের ললিতকলা সম্পর্কিত গ্রন্থটি রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক নাট্যকার রূপে পরিচিত শ্যামাচরণ শ্রীমানীর ললিতকলা সম্পর্কিত 'আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি' বাংলা ভাষার প্রথম ললিতকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ। লকের শুভেচ্ছা নিয়েই এ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

পরবর্তীকালে বঙ্গসমাজে ললিতকলা চর্চার প্রসারে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে যে সাময়িকপত্রটি গভীর অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে তা হেনরি লকেরই একাধিক ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তদানীন্তন শিল্পীদের চারুকলা অনুশীলনের নিদর্শন বঙ্গসমাজে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল এই মাসিকপত্র।

এই সাময়িকপত্রটির আত্মপ্রকাশের কয়েক বছর আগে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এদেশের শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আর্ট স্টুডিও। শিল্প রচনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ যে সত্যিই সম্ভব তা সর্বপ্রথম লকের ছাত্রেরাই প্রমাণ করেন 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' নামে এক চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫ বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত এই চিত্রশালার প্রধান পরিচালক ছিলেন লকের যশস্বী ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' প্রকাশিত দেব-দেবী ও

পৌরাণিক ঘটনার রঙীন লিথোগ্রাফ সে যুগে বাঙলার ঘরে ঘরে যখন প্রচারিত হয় তখন রাজা রবি বর্মার 'ওলিওগ্রাফ' সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষমাণ এক অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিশুদের অক্ষর পরিচয় সম্পন্নের জন্যও সচেষ্ট হয় এই 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও।' এঁদের প্রকাশিত ক্রমোলিথো-গ্রাফিক 'আলফাবেট বোর্ড' সেযুগে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হেনরি লকের নিষ্ঠার সৃষ্টি যে শিল্পীবৃন্দ তাঁরা আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। চারুকলা আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন এবং পালাবদলের ইতিহাসে তাঁরা আজ গবেষণার বিষয়। তবুও তাঁদের মধ্যে যাঁরা আজও স্মরণীয় তাঁদের অগ্রদূত শ্যামাচরণ শ্রীমানী। অতঃপর স্মরণীয় শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল পাল, কালীধন চন্দ্র, নবকুমার বিশ্বাস বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্র চারুকলার নানা শাখায় কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ হন।

চারুকলা চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে অতঃপর দেখা দিল শিল্পীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। সে প্রয়োজনীয়তার নেপথ্যে ছিল আরও এক উদ্দেশ্য—তা হল আপামর মানুষের মধ্যে সুকুমারকলার প্রচার। তাই উনিশ শতকেই জন্ম নিল বাঙালীর নিজের চারুকলা সংস্থা 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর দি প্রোমোশান অব ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ন্যাশনাল গ্যালারি'। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ চারুকলা সংস্থার নেপথ্যে গঙ্গাধর দে, অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কার্তিকচন্দ্র নাগ প্রমুখ যে শিল্পী-ভাস্করেরা ছিলেন তাঁদের সকলেরই আদর্শ ছিল হেনরি লক।

পরবর্তীকালে লকের পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়ে রোহিণীকান্ত নাগ, শশিকুমার হেশ, হরিনারায়ণ বসু, রণদাপ্রসাদ গুপ্ত, পরেশনাথ সেন, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ফণীন্দ্রনাথ বসু ও হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ললিতকলার জগতে যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে গৌরবের যোগ্য। পরবর্তী যুগে এ উত্তরাধিকারের গৌরবে যে ছাত্রেরা গৌরবান্বিত তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ দাস, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশ সিংহ, যামিনী রায় ও অতুল বসুর নাম স্মরণীয়।

অপরদিকে এ শতাব্দীর সূচনায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম নিল বাঙালীর দ্বিতীয় চারুকলা সংস্থা 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রণদাপ্রসাদ গুপ্ত, ননীগোপাল গোস্বামী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের আহ্বানে এগিয়ে এলেন বহু কৃতী শিল্পী। জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গীয় কলা সংসদের কার্যালয়।

'বঙ্গীয় কলা সংসদ' প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সরকারী আর্ট স্কুলে হ্যাভেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, হাকিম মহম্মদ খান, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ,

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ ছাত্র-শিষ্যদের নিয়ে চারুকলা অনুশীলনের যে নবযুগের সূচনা সেখানেও দেখি পরলোকগত হেনরি লকের প্রবল প্রভাব। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূচনায় হেনরি লকের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে যখন অবনীন্দ্রনাথকে উদ্যত দেখি তখনই মনে হয় হেনরি হোভার লকের আদর্শ ও ভাবধারা এদেশের ললিতকলা অনুশীলনের পালাবদলের ইতিহাসেও অক্ষুণ্ণ ছিল। হেনরি লকের সার্থকতা সেখানেই সুপ্রমাণিত।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী

বাংলা ভাষায় ভারতের ভাস্কর্য,
স্থাপত্য ও চিত্রকলা অবলম্বনে
গ্রন্থরচনার পথিকৃৎ

অবশেষে পেয়ে গেলাম। ভাবতেই পারিনি এ তথ্য কোনদিন পাওয়া যাবে। তাই প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে আবার যখন শতবর্ষের পুরনো খবরের কাগজের পাতায় চোখ ঘুমিয়েছি তখন আমার বুকে অকম্পনীয় এক ঐশ্বর্য প্রাপ্তির ক্ষিপ্রগতি হৃদস্পন্দন।

গবেষণার মাধ্যমে যাঁরা অতীতের ঐতিহ্যকে অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উদ্ধার করে বিদগ্ধ সমাজকে উপহার দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা এদেশে কম নয়। বাংলা সাহিত্যের গবেষককুলে এমন গগনচুম্বী যশের অধিকারী যাঁরা তাঁদের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের সূত্র সন্ধানের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে শতাব্দীর অন্ধকারে আত্ম-গোপন করে থাকার পর শ্যামাচরণ শ্রীমানীর মৃত্যুসংবাদ যখন উদ্ধার করা হল তখন তাঁর পরলোকগমনের শতবর্ষ আসন্ন। কিন্তু তর্পণের এই মুহূর্তে দেওয়া গেল না তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি। বাংলার বিদ্বৎসমাজের জন্যে রেখে যাওয়া তাঁর গ্রন্থ তিনটি এবং পরলোকগমনের সংবাদের মধ্যে দিয়েই পথিকৃৎ শ্যামাচরণের অসমাপ্ত আলেখ্য আজকের মত উন্মোচিত হোক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা যখন উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে সমাসীন তখন তাঁদের পশ্চাতে এসে তিনিও দাঁড়িয়ে-ছিলেন। বাংলার সারস্বত সমাজে তাঁর আত্মপ্রকাশ এক নাটক হাতে। সে নাটকটির নাম 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'। নাটকটি প্রকাশের প্রায় চৌদ্দ বছর পর তিনি উপহার দিয়েছিলেন এক অচিন্তিতপূর্ব গ্রন্থ যার নাম 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'। দ্বিতীয় গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশের পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিংহল-বিজয় কাব্য'। তৃতীয় গ্রন্থটি প্রকাশের পরই শ্যামাচরণের. ইহলোক ত্যাগ।

বিগত শতকের মধ্যভাগে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে নানা সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, লাম্পট্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনার প্রেরণায় নাট্যকারেরা যখন ব্যস্ত তখন 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' হাতে শ্যামাচরণের আত্মপ্রকাশ। ১৭৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর এ ছোট্ট নাটক রচনার উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহের কুফলের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত। রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ স্বনামধন্যেরা যখন নাট্যকাররূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসরমাণ তখন তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামাচরণ। রাম-নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনার ছয় বছরের মধ্যে শ্যামাচরণের 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'-এর আত্মপ্রকাশ। মাইকেল মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মালতী মাধব' শ্যামাচরণ-রচিত নাটকটির মাত্র এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' এবং মাইকেলের 'পদ্মাবতী' শ্যামাচরণের নাটকের সঙ্গে একই বছরে আত্মপ্রকাশ করে।

নাটক-রচয়িতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শিল্পী। এদেশে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ললিতকলা অনুশীলনের আদিপর্বের অন্যতম অগ্রণী শ্যামাচরণের যখন 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' প্রকাশিত হয় তখন তিনি কলকাতার চারুকলা বিদ্যালয় 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট''-এর ছাত্র।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। বেসরকারী এই স্কুলে ললিতকলার বিবিধ শাখার সঙ্গে ব্যবহারিক কারু ও চারুকলা অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। এক কমিটি কর্তৃক পরিচালিত এই স্কুলে কয়েকজন পেশাদার ইউরোপীয় শিল্পী শিক্ষকতা করতেন। প্রায় দশ বছর চলার পর তদানীন্তন লেফ-ট্যানেণ্ট-গভর্নর স্যার সিসিল বিডনের উদ্যোগে 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট''-এর পরিচালনভার বাংলা সরকার গ্রহণ করেন। স্কুলটি সরকারী আওতায় আসার পর হেনরি হোভার লক (১৮৩৭—৮৫) এই শিক্ষায়তনের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন (১৮৬৪) এবং তাঁর যোগদানের পর শিক্ষায়তনটির নাম হয় 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট''।

'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট''-এ শ্যামাচরণের কবে যোগদান তা জানা না গেলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' প্রকাশের সময় তিনি এ শিক্ষায়তনের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থটির মধ্যেই রয়েছে এ তথ্যের সন্ধান। 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'-এর শেষ পৃষ্ঠায় 'শুদ্ধিপত্রে' গ্রন্থকার লিখেছেন—''কলিকাতাস্থ শিল্প বিদ্যালয়ে শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানির নিকট তত্ত্ব করিলেও উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।''

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেনরি হোভার লকের যোগদানের পরেও সরকারী আর্ট স্কুলে তাঁর চারুকলা অনুশীলন অব্যাহত ছিল। এই শিক্ষায়তনেই তিনি কাঠখোদাই ও লিথোগ্রাফি আয়ত্ত করেছিলেন। পরে হেনরি লকের তত্ত্বাবধানে জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং বা জ্যামিতিক চিত্রকলাও অনুশীলন করেন। যে চিত্রকলা অনুশীলনের মাধ্যমে এঞ্জিনীয়ারিং এবং স্থাপত্যবিদ্যা অধ্যয়ন করা হয় তা জ্যামিতিক চিত্রকলা নামে পরিচিত।

সরকারী আর্ট স্কুলে শ্যামাচরণের চিত্রবিদ্যা অনুশীলনের সমাপ্তি ঠিক কোন্ সময়ে তাও উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে সে যুগের রীতি অনুযায়ী আর্ট স্কুলে দীর্ঘদিন চারুকলা অনুশীলন যে তাঁর অব্যাহত ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী আর্ট স্কুলে এক অচিন্তনীয় অধ্যায়ের সূচনা করেন অধ্যক্ষ লক। ইংরেজ শাসনের সে যুগে চারুকলা শিক্ষায়তনে যখন ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিল্পীদের শিক্ষকতার একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল তখন হেনরি লক যে তিনজন বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রকে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের দুজনেই ছিলেন ভারতীয়। শিক্ষকের পদমর্যাদাপ্রাপ্ত দুজন ভারতীয় ছাত্রের অন্যতম শ্যামাচরণ শ্রীমানী। আর্ট স্কুলের তদানীন্তন হেডমাস্টার গ্যারিকের পদত্যাগহেতু হেনরি লক শ্যামাচরণ, অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং আর বি লসনকে শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, হেনরি লকের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা প্রথিতযশা হয়েছিলেন তাঁদের অগ্রণী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯-১৯০৫)। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদ সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শ্যামাচরণের সমসাময়িক হয়েও অন্নদাপ্রসাদ তাঁর অনুগামী ছিলেন।

৩

হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্রের সহকর্মীরূপেও তিনি পরিচিত। হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে যে 'ন্যাশনাল সোসাইটি' ও 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা তার সংগঠক রূপেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ন্যাশনাল গ্যাদারিং, ন্যাশনাল সোসাইটি, ন্যাশনাল পেপার এবং ন্যাশনাল স্কুলের ললিতকলা সম্পর্কিত বিষয়ের তিনিই ছিলেন প্রধান প্রবক্তা। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই তিনি তরুণ সমাজকে শিল্পকলায় আকৃষ্ট করার কাজে ব্রতী হন।

উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে যখন চারুকলা অনুশীলন ব্রাত্যের জীবিকারূপে বিবেচিত হতো তখন শ্যামাচরণই শুরু করেন ললিতকলা চর্চার প্রসার আন্দোলন। নবগোপাল মিত্র পরিচালিত সভা-সমিতি, স্কুল, সংবাদপত্র এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর প্রচার পর্বের সূচনা। যুবসমাজকে শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট করার সে অধ্যায় নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত ন্যাশনাল পেপারে প্রাপ্তব্য। এ সংবাদপত্রের সূত্রেই দেখা যায় ভারত-শিল্পকলা প্রসঙ্গে 'ন্যাশনাল মিটিং'-এর উদ্যোগে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে শ্যামাচরণের যখন বক্তৃতা প্রদানের সূত্রপাত তখন সেখানে তঁার প্রধান সহযোগী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর শ্যামাচরণ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'ন্যাশনাল পেপারে' লেখা হয়েছিল (২৩ নভেম্বর ১৮৭০) ঃ

"Baboo Dwijendra Nath Tagore showed to what an elevated status Indian Arts had reached in ancient times. He refuted the commonly received notion that the Indian artists had no knowledge of perspective by quotations from Kalidas slokas in the Shokuntalah drama. He was succeeded in his animated address, by Baboo Shama Churn Sreemani, who dwelt at length, upon the history of Indian Arts, in which he gave a vivid description of the places, where the best Indian works of Arts may be found. He ended his address with an eloquent preoıation, urging his young countrymen, to cultivate the taste of Arts."

৪

হিন্দুমেলার সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন শ্যামাচরণ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের হিন্দুমেলার প্রস্তুতিপর্বে প্রদর্শনী বিভাগ সংগঠনের জন্যে যে 'আর্ট সাব-কমিটি' গঠিত হয় সেখানেও তিনি উপস্থিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্র মল্লিক, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে শ্যামাচরণও হিন্দুমেলার 'আর্ট সাব-কমিটি'র সদস্য

নির্বাচিত হন ; শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ ও বাছাই করার সঙ্গে এ প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে নিজের রচিত চারুকলা সামগ্রীও তিনি উপস্থিত করেছিলেন। হিন্দুমেলার ষষ্ঠ-বার্ষিক প্রদর্শনীর সাফল্যের মূলে শ্যামাচরণের অবদান কতটা তার সংবাদ ন্যাশনাল পেপারে পাওয়া যাবে। ষষ্ঠ-বার্ষিক হিন্দুমেলার প্রদর্শনীর সাফল্য সম্পর্কে ন্যাশনাল পেপারে লেখা হয়েছিল (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) ঃ

"The collection of paintings in the department of Fine Arts was attractive. Baboo Promothonath Mitter, a good painter, Baboo Shama Churn Sreemani, Professor of the Industrial School of Arts, contributed a great deal to the success of the exhibition."

৫

চারুকলা অনুশীলন, সঙ্গীত ও ব্যায়ামচর্চার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ১৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির বাড়িতে ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন নবগোপাল মিত্র। ন্যাশনাল স্কুলে চারুকলা বিভাগে চিত্রবিদ্যা ও মূর্তি গড়ার শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্যামাচরণ। স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় দুমাস পরে প্রকাশিত ন্যাশনাল স্কুলের অগ্রগতির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সপ্তাহে দুদিন প্রায় কুড়িজন ছাত্র তাঁর অধীনে চারুকলা অনুশীলনে রত ছিলেন। ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিবেদন পরিবেশন প্রসঙ্গে ন্যাশনাল পেপারে আরও যা লেখা হয়েছিল তা উদ্ধারযোগ্য (১৯ জুন ১৮৭২) ঃ

"The Arts class under Baboo Shama Churn Sreemani, the principal teacher of the Government School of Industrial Arts, (about whom honorable mention is made in every successive Report of the Institution) is making a good progress....The success of the class is chiefly owing to the indefatigable exertions of Baboo Shama Churn Sreemani. The promoters of the school are such indebted to him for his kind exertions."

৬

কিন্তু চারুকলা শিক্ষাদানের মধ্যে তৃপ্ত ছিলেন না তিনি। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন এঞ্জিনীয়ার। তাই তিনি এক আবেদন প্রচার করেছিলেন ন্যাশনাল পেপারের মাধ্যমে। সে আবেদনে ন্যাশনাল স্কুলে চারুকলার সঙ্গে জ্যামিতিক চিত্রকলা শিক্ষাদানের অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেন। বলা বাহুল্য, ন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোক্তারা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সে প্রস্তাব। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১ আগস্ট ন্যাশনাল স্কুলে শ্যামাচরণের জ্যামিতিক চিত্রকলা শিক্ষাদান শুরু। যে দশজন ছাত্রকে নিয়ে সপ্তাহে তিন দিন তাঁর জ্যামিতিক চিত্রকলা শিক্ষাদানের সূচনা তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বি এ এবং এম এ উত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। জ্যামিতিক চিত্রকলা বিভাগের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্যামাচরণ এক ভাষণ দেন। নীচের উদ্ধৃত

সে ভাষণের মধ্যে নিহিত রয়েছে এ বিষয়ের সংবাদ। তাঁর এ ভাষণটিও ন্যাশনাল পেপারে প্রকাশিত হয় (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২) ঃ

"Gentlemen, I have much pleasure to see you here assembled for the purpose of studying one of the most important branches of drawing, viz.—Geometrical Drawing. But I must say that I could not have ventured to announce the opening of this class, had not some unexpected events favourably presented themselves. The first and principal of these is the establishment of the National School... Although from a long time passed, I have been trying to open an institution of the nature, yet I fear, the school could not have existed but for the indefatigable exertions of our friend Babu N. G. Mitter."

সরকারী আর্ট স্কুলের শিক্ষক শ্যামাচরণকে বেসরকারী এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার সম্মতি দিয়ে হেনরি লক যে উদারতা দেখিয়েছিলেন তাও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। সে কারণে, এ ভাষণে, হেনরি লকের উদ্দেশে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আরও যা বলেছিলেন সেখানে তাঁর জ্যামিতিক চিত্রকলা অনুশীলনপর্বের প্রকৃত তথ্যটিও প্রাপ্তব্য। ন্যাশনাল স্কুলে প্রদত্ত এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"Another thing which ought to be counted with the forgoings, is the kind permission ..of the energetic Principal of the Govt. School of Arts Mr. H. Locke to open this class. I could not have moved a single step towards the establishment of such a class without his permission. I take this opportunity therefore, to thank the gentleman with my heart and soul, and at the same time to express my gratitude for the kindness with which he has trained me through that course of instruction which I now venture to impart to you."

জ্যামিতিক চিত্রকলা কী এবং এ চিত্রকলার সাহায্যে তরুণেরা কতটুকু উপকৃত হবেন সে প্রসঙ্গও তিনি আলোচনা করেন। প্রাঞ্জল বক্তব্যের মাধ্যমে জ্যামিতিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ

"The study of Geometrical Drawing gives one the power to delineate, by plans, elevations, and sections, the length, breadth and height, or in other words the magnitude and make of any object, whether a house, a machine, a bridge, a boat or a fort."

৭

ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতার সময়ে তাঁর সর্বাধিক স্মরণীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনার সূচনা। তাঁর এ গ্রন্থটির নাম 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা

অবলম্বনে রচিত এ গ্রন্থটি লিথোগ্রাফ ও কাঠখোদাই চিত্রদ্বারা শোভিত। গ্রন্থটি তিনি হেনরি লককে উৎসর্গ করেছিলেন এবং গ্রন্থ সম্পর্কে লক যে অভিমত প্রকাশ করেন তা এ গ্রন্থে যুক্ত হয়।

শ্যামাচরণের এ গ্রন্থ রচনার মূলে ছিল নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল' আন্দোলন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শ্যামাচরণ এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুবসমাজ ও শিক্ষিত মানুষের কাছে ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য তুলে ধরেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিক-তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও এক অনুপ্রেরণা যার পরিণতি 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'। এ অনুপ্রেরণা অবশ্যই তিনি পেয়েছিলেন হেনরি লকের কাছ থেকে। তাঁর রচিত এ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে পাওয়া যাবে এ বক্তব্যের সমর্থন। 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'র উৎসর্গপত্রে শ্যামাচরণ যা লিখেছেন সেখানেই চিরস্থায়ী হয়ে আছে হেনরি লকের ভারত-শিল্প প্রীতির সন্ধান এবং এই একটি মাত্র সূত্র থেকেই বলা যায় যে, ই বি হ্যাভেলের ভারতে আসার বহু আগে যে বিদেশী-চারুকলা-শিক্ষক ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার কেবল অবেক্ষণই নয়, তার প্রতি বঙ্গসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি হেনরি লক। হেনরি লকের ভারত-শিল্পকলার অবেক্ষণ প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ তাঁর উৎসর্গপত্রে লিখেছেন ঃ

"Feelings of due respect and regard, prompt me to dedicate to you this my little work—the first fruit of the valuable instruction I have received under you. Permit me therefore, with your usual kindness, to inscribe to you this little book intended to reflect, though in a very small degree, on the minds of my countrymen the lustre of the Artistic works of our venerable fore-fathers, which you cultivate with so much zeal and pleasure."

ভারতের শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজের এক ছাত্রকে গ্রন্থরচনায় উদ্যোগী হতে দেখে হেনরি লক সাধুবাদ জানান। তাঁর সাধুবাদ জ্ঞাপনের প্রধান কারণ ছিল যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্যামাচরণ ভারতের শিল্পসম্পদকে জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঞ্জোরের রাম রাজা এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম মনে রেখেও তিনি গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু রাম রাজা ও রাজেন্দ্রলালের গবেষণাকর্ম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রাপ্তব্য। শ্যামাচরণ প্রথম মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি আলোকপাত করেন।

সে যুগে বহু চিন্তাশীল লেখকের লেখনীতেও প্রতিধ্বনিত হয় একই অভিমত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের নাম করা যেতে পারে। শ্যামাচরণের এ গ্রন্থ বঙ্গদর্শনেও সমালোচিত হয়েছিল এবং সে সমালোচনা প্রচলিত সমালোচনার চেয়ে আকারে ও আস্বাদে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। বঙ্গদর্শনের গ্রন্থসমালোচনা বিভাগের নাম ছিল 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। উল্লেখ্য, 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' বঙ্গদর্শনের 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র

এক প্রবন্ধে সমালোচিত হয় (ভাদ্র ১২৮১)। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সমালোচিত হতে দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রও উপলব্ধি করেছিলেন এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা। সে কারণে—প্রথাগত রীতিতে গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত না করে গ্রন্থটিকে 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' শীর্ষক নয়পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধে সমালোচনা করে মর্যাদা দান করেছিলেন। বঙ্গদর্শনের এ প্রবন্ধের মাধ্যমে গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ বিস্তর। সে কারণে বঙ্গদর্শন থেকে উদ্ধৃত করা হল সমালোচনার কিয়দংশ ঃ

"কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য জনিকা বিদ্যা।...

কাব্যের সঙ্গে, অন্যান্য 'সূক্ষ্মশিল্পের' এত প্রকৃতিগত বিভেদ যে এক্ষণে, অনেকেই ইহাকে আর 'সূক্ষ্মশিল্প' মধ্যে গণ্য করেন না; নৃত্য, গীত, সামাজিক সামগ্রী, একা বিদ্বানের নহে, সুতরাং উহাও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং 'সূক্ষ্মশিল্প' নাম করিলে, আপাতত চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যই মনে পড়ে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমাণির গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই তিন বিদ্যার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে, সাধারণত সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য।...আমরাও তাহা পুনরুদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।...

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন।...

শ্রীমাণিবাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্বতাভ্যন্তরে খোদিত হইয়া প্রস্তুত; দ্বিতীয়, যে সকল পর্বতের বাহ্যাভ্যন্তরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।...

নশ্বর চিত্রপট, অযত্নে রাখিলে প্রস্তরাদির ন্যায় অধিককাল স্থায়ী হয় না; এজন্য শ্রীমাণিবাবু অজন্তা ও বাঘের গুহাস্থিত ফ্রেস্কো পেণ্টিং ভিন্ন আর কোন চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।...

যাহা হউক, শ্রীমাণিবাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে শ্রীমাণিবাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত, এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টিলাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এত কথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি।..."

হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গলি, ভারত-সংস্কারক, তত্ত্ববোধিনী, ন্যাশনাল পেপার, অমৃতবাজার প্রভৃতি আরও কয়েকটি পত্রপত্রিকায় গ্রন্থটি সমালোচিত হয় এবং সব সমালোচকই

গ্রন্থটিকে স্বাগত জানান। মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' সাময়িকপত্রেও সমালোচিত হয় এ গ্রন্থ (চৈত্র ১২৮০)। মধ্যস্থের সে সমালোচনায় এ গ্রন্থের তাৎপর্য প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল ঃ

"স্বর্ণকারের 'দোকান ঝাড়া' ক্রয়কারীরা যেমন বিস্তর আয়াসে বিস্তর ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে দুই এক গুঁড়া সুবর্ণ রজত লাভ করে, তেমনি আমাদের যন্ত্রালয়সমূহ-নিক্ষিপ্ত রাশি রাশি জঞ্জাল ঠেলিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একখানি গ্রন্থের নাম-যোগ্য গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে।...

...আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ এবং পাঠকসাধারণ তৎপ্রতি সাদর ব্যবহার করেন এমন ভরসাও করিতেছি। ইহার গুণ বিস্তর, দোষ অতি যৎসামান্য। ...ইহার ফলশ্রুতি বহু—তন্মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিব। প্রথম, এতদ্দ্বারা আমাদিগের পূর্ব পুরুষ আর্য্যজাতির আশ্চর্য শিল্পচাতুরীর জ্ঞান কিয়দংশে জন্মে...। দ্বিতীয়, আমাদের 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' নামা কতগুলি ক্ষুদ্রাশয় সাহেব সর্বদাই বলিয়া থাকেন 'ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবত শিল্পী নয়, কৃষক—তাহারা কৃষি লইয়াই থাকুক—ইংলণ্ড মহাশিল্পের স্থান, সুতরাং শিল্পজ পদার্থমাত্রের নিমিত্তই ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতেই হইবে।...' শ্যামাচরণবাবু যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ যতই প্রকাশ পাইবে, ততই সেই মূঢ়তানাশের মহদুপায় হইতে পারিবে।"

দীর্ঘদিন পরে শ্যামাচরণের এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সে কারণে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে তিনি এ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। শ্যামাচরণের পরলোকগমনের ত্রিশ বছর পর সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে অবনীন্দ্রনাথের যোগদান (১৯০৫)। যোগদানের পর গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ 'আর্য্য-জাতির শিল্পচাতুরি' গ্রন্থের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত প্রসঙ্গে শ্যামাচরণের উৎসর্গপত্র ও তার উত্তরে লেখা হেনরি লকের অভিমতের যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন তা নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'জাহ্নবী' সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩১৩)। অবনীন্দ্রনাথ অনূদিত সে অধ্যায়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে শ্যামাচরণের ভূমিকা। 'জাহ্নবী'-তে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ অনূদিত 'ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর' শীর্ষক সে রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হল তার অংশবিশেষ ঃ

"প্রিয় শ্যামবাবু—তোমার উপহৃত পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম—আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, যে সুযোগ, তত্ত্বানুসন্ধান এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এ পর্যন্ত তোমার স্বদেশীয়গণের নিকট সুপ্রাপ্য ছিল না, এবং সেই কারণেই বঙ্গবাসীগণ একদিকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পথে যেমন অধ্যবসায় এবং প্রশংসার সহিত অগ্রসর হইতেছেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পচর্চা সম্বন্ধে একেবারে মনোযোগ দিতেছেন না। ভারতের পুরাতন শিল্পকলার সম্যক্ চর্চা করিতে হইলে

যে অবকাশ এবং সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজন, আমি জানি, তাহা তোমার নাই ; তথাপি তুমি তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তাহাদের মাতৃভাষায় তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার জন্য এই যে পুস্তক রচনা করিয়াছ, ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের বহুল প্রচারেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট তোমার এই স্বল্প চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।"

শ্যামচরণের এ গ্রন্থ আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তিনিই প্রথম 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'-র মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পীসমাজকে পাশ্চাত্য চিত্রকলার অন্ধ অনুকরণের মোহ ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অজন্তা ও বাঘের গুহাচিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত তাঁর এ হুঁশিয়ারির মধ্যে যে ইঙ্গিত তা পরবর্তী কালে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শে পরিণত হয়। অতএব শ্যামাচরণের সে সতর্কবাণী উদ্ধার করা হল ঃ

"অধুনা কেহ কেহ ইংরেজদিগের চিত্রবিদ্যার শিক্ষাতে যত্নিনয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিত্ররচনার গুণের মধ্যে প্রায় অবিচল অনুকরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে বাস্তবিকও তাহাকে গুণ মনে করিয়া তাঁহারদিগের চিত্রের প্রশংসা করেন যে 'আহা ! ঠিক্ অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে'। এইরূপ প্রশংসা শুনিলেই চিত্রকর আপনার সকল পরিশ্রম সফল মনে করেন। কিন্তু আমার মতে উক্ত রূপ অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে। যদিও স্থান বিশেষে অনুকরণ কতক পরিমাণে শোভা পায় বটে, কিন্তু অনুকরণ মাত্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের বিশেষ গুণপণা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাতে কল্পনা শক্তির যত স্ফূর্তি দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রসূত হয়।... অতএব যাঁহারা চিত্র বিষয়ে নিপুণতা উপার্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কর্তব্য এই যে, কোন স্বভাব-সুন্দর ভাববিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া কিসে চিত্রে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তায় লাগিয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে স্বভাবের অবারিত দ্বারে প্রবেশ পূর্বক তাহার আয়োজন করেন—অনুকরণের পথ একেবারেই পরিত্যাগ করেন।"

৮

যে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্যামাচরণের 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' রচনা সেই আদর্শেই রচিত হয় তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'সিংহল-বিজয় কাব্য'। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চারটি সর্গে বিভক্ত একশো আঠারো পৃষ্ঠার এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় এ গ্রন্থটির বিষয়। নানা পত্র-পত্রিকায় সমালোচিতও হয়েছিল এ গ্রন্থটি। কিন্তু 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' রচনার জন্যে তাঁর যে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ তা তিনি 'সিংহল-বিজয় কাব্য' রচনার জন্য পাননি। এমনকি 'সিংহল-বিজয়

কাব্য' সমালোচনার সময় সমালোচকেরা 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'-র অবতারণা প্রসঙ্গে শ্যামাচরণকে কাব্যরচনায় নিবৃত্ত হতে অনুরোধও জানান। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' সাময়িকপত্রে 'সিংহল-বিজয় কাব্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য। 'মধ্যস্থ'-র সমালোচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করা হল (চৈত্র ১২৮১) ঃ

"বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী এই কাব্যের প্রণেতা। ইনি ইতিপুর্বে 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' নামা একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। উভয় পুস্তকেই তাঁহার স্বদেশানুরাগ জাজ্জ্বল্যমান। তিনি শিল্প বিষয়ে প্রসিদ্ধ এবং শিল্প বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক। হিন্দুমেলার শিল্পশাখায় ইনিই প্রধান অধ্যক্ষ। ভরসা করি, শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে ভূষিতা ও বর্দ্ধিতা করিতে তিনি বিস্মৃত না হয়েন। কাব্য লিখিবার লোক অনেক আছেন, কিন্তু মহোপকারী শিল্প-শাস্ত্রবিৎ নাই বলিলেই হয়। সুদ্ধ এই জন্যই এই অনুরোধটি করিলাম।"

এ গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল। কারণ, বিদ্যাসাগরের হাতে তুলেও দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি এ গ্রন্থ। নিজের হাতে লিখে দেওয়া শ্যামাচরণের কাব্যগ্রন্থটি সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগর সংগ্রহে প্রাপ্তব্য। স্বরচিত সে গ্রন্থের আখ্যাপত্রে শ্যামাচরণ লিখেছিলেন—"পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সমীপেষু/গ্রন্থকারের সপ্রণাম উপহার/শ্যামাচরণ শ্রীমানী।"

৯

তারপরেই চিরতরে অন্তর্হিত হলেন ৬১, সিমুলিয়া স্ট্রীটের শ্যামাচরণ। বিগত শতকের চারুকলা আন্দোলনের অধ্যায়কে যখন গ্রন্থনার চেষ্টা তখনই পাওয়া গেল তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ এক ইংরেজী সংবাদপত্রে। সে সূত্র ধরে পশ্চাৎ অন্বেষণের সামান্য চেষ্টায় সাপ্তাহিক 'ভারত-সংস্কারক'-এও পাওয়া গেল তাঁর পরলোকগমনের তারিখ ও কারণ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৮ মে 'ভারত-সংস্কারক' পরিবেশন করেছিল ঃ

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি কলিকাতা আর্ট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী গত ২১এ মে রাত্রে ওলাওঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী' পুস্তক লিখিয়া এদেশের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় ভদ্রলোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না।"

তাঁর অন্তর্ধানের পর অতিক্রান্তও হয়েছে পূর্ণ একটি শতাব্দী। সেই শতাব্দী কালের সময়ে গড়ে উঠেছে যে শিল্পকলা, নাটক ও কাব্য তার সমীক্ষাও করা হয়েছে নানাভাবে। সেসব সমীক্ষায় উল্লেখও আছে শ্যামাচরণের, কিন্তু সমীক্ষাগুলির কোনটিতেই নেই তাঁর অন্তর্ধানের কারণ বা সময়. নেই প্রাক্-অবনীন্দ্র যুগের চারুকলা আন্দোলনের এক অগ্রণী পথিক শ্যামাচরণের পথ-চলার কাহিনী। এই নিবন্ধই হোক তাঁর স্মরণ শতবর্ষের স্মারক।

হরিশ্চন্দ্র হালদার

রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর চারুকলাচর্চার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন প্রায় ততদিন অব্যাহত ছিল তাঁর চিত্রসাধনা। তাঁর চিত্রকলার শৈল্পিক মাধুর্য ছাড়াও অতিরিক্ত এক অবদান আছে যা তাঁর পরলোক-গমনের দীর্ঘকাল পরেও বার বার অনুভূত হয়। কারণ, অতীতের বহু হারিয়ে যাওয়া মুখের সন্ধান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রকলায় সহজলভ্য। স্বভাবতই মনে হয়, দূরদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরবর্তীকালের জন্য যেন এক দর্পণ রেখে গিয়েছেন তাঁর চিত্রকলায়।

ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে কিংবা অন্যত্র, তিনি যাঁকেই পেয়েছিলেন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, তিনি ভারতীয় অথবা বিদেশী কিংবা প্রথিতযশা অথবা স্বল্পপরিচিত যাই হোন না কেন, তাঁকেই তিনি চিরায়ু করে রেখেছেন তাঁর চিত্রকলায়। নিজের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্য-সেবীর অগণিত মুখচ্ছবি তাঁর চিত্রকলায় বর্তমান। তাঁর রচিত মুখের মেলায় আছে তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন সুপরিচিত শিল্পীরও প্রতিকৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রকলার সতর্ক অনুসন্ধান যাঁরা করবেন তাঁরা অবশ্যই তাঁর রচিত চিত্রগুলির মধ্যে, সুপরিচিত শিল্পীদের প্রতিকৃতির সঙ্গে, এমন কয়েক-জন শিল্পীর মুখচ্ছবির সন্ধান পাবেন যাঁদের চারুকলাচর্চার অবদান অদ্যাপি অসমীক্ষিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত চিত্রসূচির অন্তর্গত এমন অসমীক্ষিত শিল্পী-কুলের প্রথম মানুষ হরিশ্চন্দ্র হালদার। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত এ প্রতিকৃতিচিত্রের একমাত্র পরিচয় "শিল্পী হরিশ্চন্দ্র হালদার"। লক্ষণীয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারুকলাচর্চার সূত্রপাত যে হরিশ্চন্দ্র হালদারের প্রতিকৃতির মাধ্যমে সেই শিল্পী হরিশ্চন্দ্রের চিত্ররচনার অবদান এ যাবৎ অনালোচিত। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের শিল্পসাধনার প্রথম পর্যায়ে যে হরিশ্চন্দ্রকে তিনি শিল্পীর সম্মানে ভূষিত করেছিলেন তাঁর চারুকলাচর্চার ইতিবৃত্ত অবশ্যই উদ্ধারযোগ্য। কারণ, রবীন্দ্র-রচনার আদিতম চিত্রকরের দুর্লভ সম্মান যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনীসৃষ্ট চিত্রের এই হরিশ্চন্দ্র হালদার।

হরিশ্চন্দ্রের প্রথম প্রতিকৃতি রচনার দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের অপর একটি প্রতিকৃতি রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

তবুও বিস্মৃতির নির্মমতা থেকে অব্যাহতি পাননি হরিশ্চন্দ্র। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা হরিশ্চন্দ্র কেবল গবেষক-সমালোচকদের অবহেলার বলিই নন—রবীন্দ্রনাথের লেখনীও যেন তাঁর প্রতি উদাসীন। কারণ,

হরিশ্চন্দ্রকে কবি তাঁর কোন রচনাতেই শিল্পীরূপে উল্লেখ করেননি, করেছেন ম্যাজিকওয়ালা-নাট্যকাররূপে।

কবির 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি'-র বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রন্থকার-ম্যাজিকওয়ালা সহপাঠীই বোধ হয় শিল্পী হরিশ্চন্দ্র হালদার। কারণ, "নাটক অভিনয় সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।" 'জীবন-স্মৃতি'র 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়ে এই ম্যাজিকওয়ালা সহপাঠীর বিষয়ে কবি উপর্যুক্ত মন্তব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কে তা অবশ্য সুস্পষ্টভাবে বলেননি।

পরবর্তীকালে আরও একজন ম্যাজিকওয়ালাকে দেখতে পাই তাঁর 'গল্পসল্প' গ্রন্থে। এ ম্যাজিকওয়ালাও নাটক রচনা ও অভিনয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকতেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই ম্যাজিকওয়ালা-নাট্যকারের নাটকে 'মুক্ত-কুন্তলা'র চরিত্রে অবতীর্ণ হন। কবির জীবিতকালের শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'গল্প-সল্প'-র (১৩৪৮) 'মুক্তকুন্তলা' অধ্যায়ে এই নাট্যকার-ম্যাজিকওয়ালা হরিশ্চন্দ্র হালদার রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছেন হ. চ হ.। সঙ্গে আছে তাঁর নাটক রচনা ও অভিনয় পরিচালনার কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা। এ অধ্যায়েও রবীন্দ্রনাথ হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চার কোন উল্লেখ করেননি। কবি 'গল্পসল্প' গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"তোমাদের বয়েসে, এমন কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিকবিশেষ। আজো মনে আছে একটা ঝলঝলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা।... আমি রাজী হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেন না আমার গলার আওয়াজটা মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ, চ, হ, আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার ... একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন।... হরীশ্চন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি।"

স্বভাবতই মনে হয় কবির 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি'-র বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রন্থকার-ম্যাজিক-ওয়ালা সহপাঠীই 'গল্পসল্প' গ্রন্থের নাট্যকার-ম্যাজিকওয়ালা হরিশ্চন্দ্র হালদার। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র যে শিল্পীও ছিলেন তা কবির রচনায় প্রাপ্তব্য নয়। এমনকি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হরিশ্চন্দ্রের একাধিক মুখচ্ছবি রচনা করেন তিনিও তাঁর কোন রচনায়, বিশেষত তাঁর জীবনস্মৃতিতে, পরবর্তীকালের জন্য হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে কোন তথ্য পরিবেশন করে যাননি। এঁদের পরে অবনীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী ও প্রতিমা দেবী তাঁদের আলোচনায় হরিশ্চন্দ্রকে শিল্পীরূপে অভিহিত করলেও তাঁর চারুকলাচর্চা সম্পর্কে—বিশেষত তিনিই যে রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর—সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি।

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' (১৩৪৮) গ্রন্থের দুটি স্থানে হ. চ. হ.-র প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে তাঁর পরিচয় 'বিসর্জন' ও 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের দৃশ্যসজ্জা রচয়িতারূপেই বিবৃত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কথায় জানা যায় যে, কবির 'বিসর্জন' অভিনয়ের যে প্রথম অনুষ্ঠান জোড়াসাঁকোয় হয় তার সজ্জা এবং দৃশ্যপট রচনার ভার পড়েছিল হরিশ্চন্দ্রের ওপর। 'বিসর্জন'-এর অভিনয়-প্রস্তুতি প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট-দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, বিসর্জন নাটক তৈরী। এই রথীর ঘরেই প্রথম নাটকটি পড়া হলো. আমরা সব জড়ো হলুম—তখনই সব ঠিক হলো, কে কী পার্ট নেবে, রবিকাকা কী সাজবেন। হ. চ. হ. র উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সিন আঁকবার। আমিও তাঁর সঙ্গে লেগে গেলুম।" (ঘরোয়া, পৃঃ ৮)

অবনীন্দ্রনাথের মত স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীও হরিশ্চন্দ্রের চারুকলা চর্চা প্রসঙ্গে কিছু লিখে রেখে গিয়েছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর সে লেখায়ও থিয়েটারের দৃশ্যপট রচয়িতা হিসেবেই হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

বড়দের মত হরিশ্চন্দ্র একবার ঠাকুরবাড়ির কিশোর-কিশোরীদের 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ে দৃশ্যপট রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের এই অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে হিরণ্ময়ী দেবীর সে রচনায়। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'-তে প্রকাশিত কৈফিয়ৎ' শীর্ষক রচনায় হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন ঃ

"বাল্মীকি-প্রতিভা বড়দের যেমন অভিনয় হইয়া গেল, আমাদের পালা আরম্ভ হইল! স্থির হইল, আগে বড়দের এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। গোপনে সব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। স্টেজ কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি··· চিত্রকর থাকিতেন।···

আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি স্টেজ আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা! রফা হইল যে ৫০৲ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। ··· মাতৃদেবীর জন্মদিনে বড়দের সকলেই সেই ঘরে আমাদের তৈরী জল-পানের নিমন্ত্রণে আসিলেন। অভিনয়ের কথা আগে প্রকাশ করা হয় নাই। তাঁহারা আসিয়া স্টেজ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন···আমার মামা মহাশয় স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্টেজের ইতিহাস শুনিয়া হরিশবাবুর দেনা-পরিশোধের ভার লইলেন। হরিশবাবুর কপাল ভাল। আমরা কতদিনে সে টাকা শোধ করিতাম জানি না; এখন পাওনার সঙ্গে বখসিসও মিলিল। বাস্তবিক সে স্টেজ হইয়াছিল বড় সুন্দর। 'ভারতীর' মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের স্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপসিনে—মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ—আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা—কিন্তু সে ফুল,

বাগানের ফুল নয়—নাট্যাভিনেতা ছেলেমেয়েদের মুখগুলি। আজ সে মালার ফুল-গুলি কোন্‌টি কোথায়? যদি যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতাম—আজ সে ড্রপসিন অমূল্য ধন।”

পরবর্তীকালে বধূমাতা প্রতিমা দেবী কবির ও অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অভাব কিছুটা পূরণ করেছেন তাঁর 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে (১৩৫৯)। 'গল্পসল্প'-র রচনায় হরিশ্চন্দ্র নাট্যকার মাত্র; সেখানে তাঁর চারুকলাচর্চার কোন ইঙ্গিত নেই। কিন্তু প্রতিমা দেবীর আলোচনায় হরিশ্চন্দ্র একমাত্র নাট্যকাররূপেই নন, শিল্পীরূপেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সংবেদনশীল মনের এক সহানুভূতিপূর্ণ স্মৃতিকথা বলেই প্রতিমা দেবীর আলোচনা মনের গভীরে ছায়াপাত করে। সেহেতু, হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কিত প্রতিমা দেবীর আলোচনার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন ঃ

“স্বদেশী যুগের কিছু আগে মিস্টার ওকাকুরা তাঁর তিন বন্ধু আর্টিস্ট টাইকোয়ান, কাৎসুতা ও হিষিদাকে নিয়ে ভারতে বেড়াতে আসেন। এই খবর পেয়ে গগনেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। এই তিনটি জাপানী চিত্রকরই তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। ...

এই সব আর্টিস্টদের পাশে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলের তৈরি বাড়ির পুরনো বাঁধা আর্টিস্ট হ. চ. হ. তখন ম্লান হয়ে গেছেন। যেমন মামাদের স্টুডিয়োর লালপেড়ে-কাপড়পরা বঙ্গলক্ষ্মীর তৈলচিত্র জাপানী চিত্রের আভিজাত্যের পাশে দাঁড়াতে পারল না, তেমনি বেচারী হরিশ্চন্দ্র হালদার ওরফে হ. চ. হ. থেলো হুঁকো হাতে মুর্শিদাবাদ বালাপোশের তলায় লুকিয়ে পড়লেন। সিন পেণ্টিঙের জন্য তাঁর আর ডাক পড়ল না।

সেকালের সঙ্গে এই মানুষটি এমন করে জড়িয়ে আছেন যে তখনকার দিনের কথা বলতে গেলে এই লোকটিকে আপনি মনে পড়ে। শোনা যায় যখন কবি এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলে পড়তেন সেই সময় হ. চ. হ. ছিলেন তাঁদের সহপাঠী। সোদ্দাই এই বহুগুণযুক্ত মানুষটিকে সংগ্রহ করে পরি-বারের তরুণ মহলে পরিচিত করিয়ে দেন। তখনকার দিনে আর্টিস্ট এবং সাহিত্যিক হিসাবে হ. চ. হ.-র খ্যাতি ছেলেমহলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর হ. চ. হ. নামকরণ সোদ্দাই করেছিলেন। ... লোকটির গুণ ছিল অনেক। যেমন এক জাতের মানুষ আছে যারা গাইতেও পারে, আঁকতেও পারে, লিখতেও পারে. কিন্তু সব গুণ থাকা সত্ত্বেও কোথাও একটা স্ক্রু আলগা থাকায় তাঁদের প্রকৃতির সবটাই বাঁধনহীন ঢিলেঢালাভাবে প্রকাশ পায়, হরিশবাবুও ছিলেন তেমনি।

তখনকার দিনের বাড়ির ছেলেদের ভালোবাসার অসংখ্য আবদার-অত্যাচার এই লোকটিকে সহ্য করতে হত।” (স্মৃতিচিত্র, পৃঃ ৫৭-৬২)

এ আলোচনায় প্রতিমা দেবীর অভিমতকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে গ্রহণ করার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। কারণ, কবি ও তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের সহাধ্যায়ী

হরিশচন্দ্রকে প্রতিমা দেবী একমাত্র "ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের তৈরি বাড়ির পুরনো বাঁধা আর্টিস্ট" বলেই অভিহিত করেছেন।

স্মৃতিচিত্র'-র পর্যালোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষার পরেও হরিশচন্দ্রের আরও এক শিক্ষার সংবাদ প্রতিমা দেবীর অজ্ঞাত ছিল। সম্ভবত সে কারণে, সহানুভূতিপূর্ণ হলেও, বধূমাতার আলোচনায় হরিশচন্দ্রের অধিকতর উল্লেখযোগ্য শিক্ষার প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।

সে বিষয়টি হলো, হরিশচন্দ্র হালদার কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে চারু-কলার ছাত্র ছিলেন। প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় হরিশচন্দ্রকে আর্টিস্ট রূপে উল্লেখ করলেও শিক্ষায়তনের মাধ্যমে তাঁর চারুকলা অনুশীলনের বিষয় অবহিত ছিলেন না।

২

হরিশচন্দ্রের অ্যাকাডেমিক চারুকলাচর্চার সন্ধান অথবা তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে হরিশচন্দ্রের নিজের রচিত এক নাটকে। হরিশ্চন্দ্র হালদার রচিত এ নাটকটির নাম 'কালাপাহাড় বা (ধর্ম্মদ্রোহী নাটক)'। ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হরিশচন্দ্রের এ নাটকের আত্মপ্রকাশ। নাটকটির আখ্যাপত্রে বাংলা ও ইংরেজিতে নাটক ও নাট্যকারের নাম লিখিত আছে। অতিরিক্ত হিসাবে আখ্যাপত্রেই ইংরেজিতে পরিবেশিত হয়েছে ঃ "হরিশ্চন্দ্র হালদার/লেট স্টুডেণ্ট অব দি ক্যালকাটা গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট।" এই নাটকের শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, নাট্যকার পাথুরিয়াঘাটার ৩৩ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীটের অধিবাসী ছিলেন। নাটকটি জনৈক প্রিয়নাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হয়।

কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং 'কালাপাহাড়' নাটক রচয়িতা হরিশচন্দ্রই যে আলোচ্য হ. চ. হ. সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, এ নাটকের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে নাটকটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পাওয়া যাবে। 'কালাপাহাড়' নাটকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি সেহেতু উদ্ধারযোগ্য ঃ

"এই দৃশ্য-কাব্য খানি পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাই-ব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে, জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবনে, অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং পাথুরিয়াঘাটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট ৩৩ নং ভবনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।"

হরিশচন্দ্রের অ্যাকাডেমিক চারুকলাচর্চার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তার বিস্তারিত বিবরণ দুষ্প্রাপ্য। অনুমান, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পরে তিনি কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত, এ কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অঙ্কিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথম চিত্রে তাঁকে শিল্পীরূপে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

এ যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে বলা চলে হেনরি হোভার লক-এর (১৮৩৭-৮৫) অধ্যক্ষতাকালেই হরিশচন্দ্রের সরকারী আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেনরি হোভার লক কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং পরলোকগমন পর্যন্ত তিনি এই চারুকলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'কালাপাহাড়' নাটক যখন প্রকাশিত হয় তখন নাট্যকার হরিশচন্দ্র সরকারী আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

'কালাপাহাড়'-এর পরে হরিশচন্দ্রের নাট্যানুরাগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'বেদবতী বা পতি-প্রাণা' নাটিকা। ১৮০৪ শকাব্দে হরিশচন্দ্রের এ নাটিকাটি কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। এ নাটিকাটি যে শিল্পী হরিশচন্দ্রেরই রচনা তার প্রমাণ নাটিকার আখ্যাপত্রেই দৃশ্যমান। আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে "কালাপাহাড় প্রণেতা শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার প্রণীত।"

৩

হরিশচন্দ্রের চারুকলাচর্চার পূর্ণ বৃত্তান্ত অনুসন্ধানের বিষয় হলেও নির্দ্বিধায় বলা চলে তাঁর চিত্রকলার প্রধান প্রকাশন ক্ষেত্র ছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' মাসিকপত্র এবং 'বালক'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার রূপায়ণের মাধ্যমেই হরিশচন্দ্রের চিত্রকলার একটি অধ্যায়ের সমীক্ষা সম্ভব।

'ভারতী'-র যখন নবম বর্ষে পদার্পণ তখন ঠাকুরবাড়ির বালক ও কিশোরদের রচনা প্রকাশের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় সাময়িকপত্র 'বালক'-এর আবির্ভাব (বৈশাখ ১২৯২/১৮৮৫)। সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনা পরিবেশন এবং 'বালক'-এর কার্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকাশের পূর্বে স্থির হয়, প্রকাশিতব্য 'বালক' অবশ্যই সচিত্র সাময়িক হবে। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের পুত্র হিতেন্দ্রনাথের (১৮৬৭-১৯০৮) কথা স্মরণে রেখেও বলা চলে ঠাকুরবাড়ির কিশোর ও যুবা-মহলে তখন একমাত্র স্বীকৃত শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। স্বভাবতই সত্যপ্রসাদের ওপরে 'বালক'-কে সচিত্র করে তোলার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

সত্যপ্রসাদের সঙ্গে হরিশচন্দ্র হালদারও যে 'বালক' চিত্রায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারও প্রমাণ 'বালক'-এর পৃষ্ঠাতেই বর্তমান। তাঁর রচিত চিত্রের সংখ্যা, আকৃতি এবং প্রাধান্য নিশ্চিতরূপে সাক্ষ্য দেয় হরিশচন্দ্রই 'বালক'-এর প্রধান শিল্পী ছিলেন এবং একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্রভাবে রবীন্দ্ররচনা রূপায়ণের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। গবেষণার মাধ্যমে দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ না করেও দীর্ঘকাল পরে 'বালক'-এ হরিশচন্দ্রের চিত্রেরসনাক্তকরণ অতি সহজেই সম্ভব।

হরিশচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রগুলি তাঁর নামেই চিহ্নিত। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রে ইংরেজিতে "বাই এইচ সি হালদার/পেন্টার অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফার" অথবা "বাই হরিশ

হরিশ্চন্দ্র হালদার
(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)
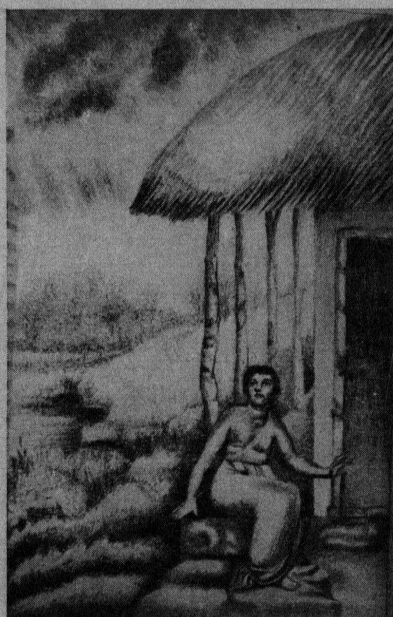
'বালক'-এ প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্র অঙ্কিত
'রাজর্ষি'-র চিত্রে জয়সিংহ
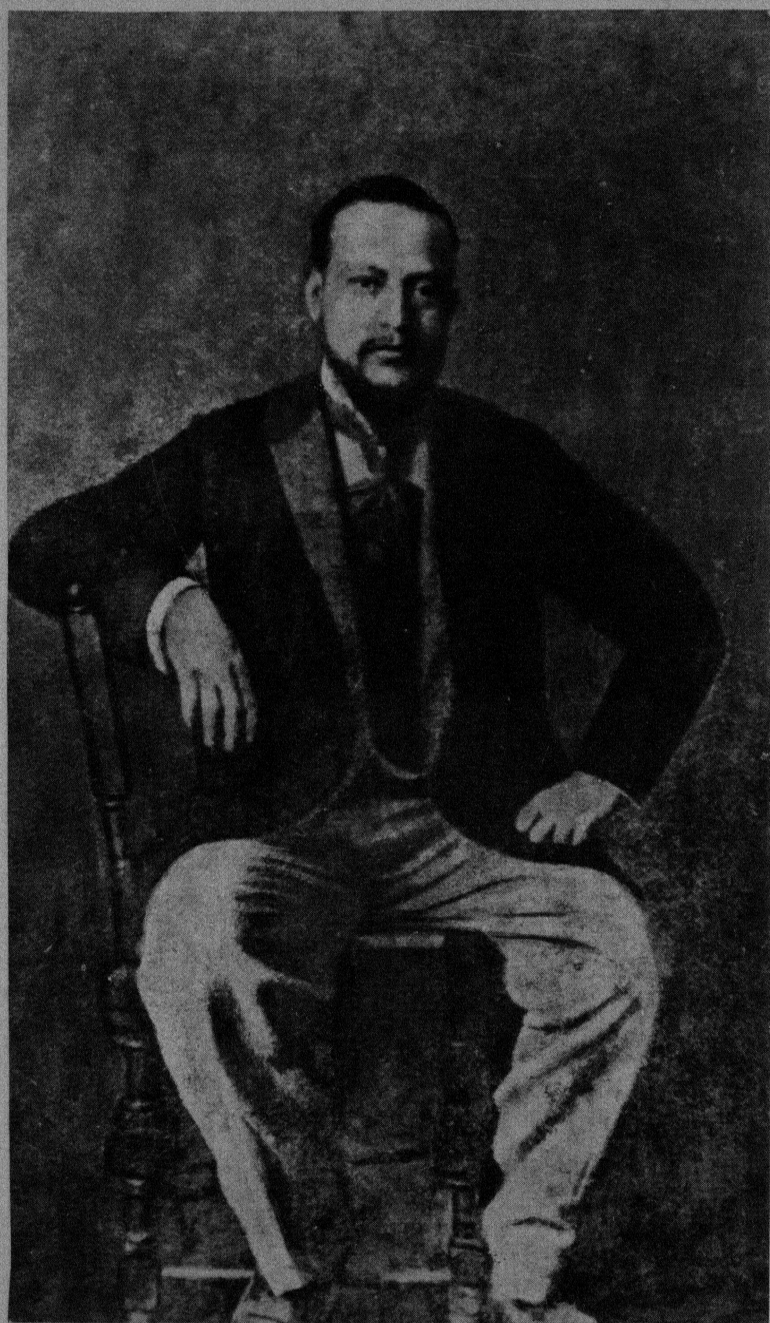
শশিকুমার হেশ

চন্দ্র হালদার” কিংবা “বাই এইচ সি এইচ” কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে। 'বালক'-এর বার্ষিক সূচীপত্রে চিত্রকরদের চিত্র তালিকা না থাকলেও মাসিক সূচীপত্রের অন্তর্গত চিত্রসূচীতে শিল্পীদের নামের সূচী বর্তমান এবং সেখানে চিত্রকরদের তালিকায় শিল্পী হরিশ্চন্দ্রের অবদান চিরস্থায়ী।

৪

মুখে মুখে প্রচলিত ছেলে-ভোলানো ছড়ার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ এ ছড়াগুলি সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এ ছড়াগুলি অবলম্বন করে তাঁর ছোটদের জন্য নানা কবিতা রচনা। এমন এক ছড়া 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-কে অবলম্বন করে কবির “বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর” কবিতাটির জন্ম। 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় কবির এ কবিতার আত্মপ্রকাশ ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাকে ভিত্তি করে শিল্পী হরিশ্চন্দ্রেরও আত্মপ্রকাশ 'বালক'-এর পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আগের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চার সে দৃষ্টান্ত এখনও উজ্জ্বল এবং এ চিত্রে তাঁর স্বাক্ষরও সুস্পষ্ট। কবির “মনে পড়ে ঘরটি আলো/মায়ের হাসিমুখ/মনে পড়ে মেঘের ডাকে/গুরু গুরু বুক”-এর যথাযথ প্রতিচ্ছবি হরিশ্চন্দ্র অঙ্কিত এ চিত্রে পরিস্ফুট।

'বালক'-এ হরিশ্চন্দ্রের রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় চিত্রায়ন 'মা লক্ষ্মী' কবিতাটির পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র। চিত্রেই উৎকীর্ণ আছে “বাই এইচ সি হালদার”। তদুপরি পত্রিকার চিত্রসূচীতেও শিল্পীর নাম বর্তমান (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২)।

ছোটদের জন্য রচিত কবির অন্যতম স্মরণীয় কবিতা 'সাত ভাই চম্পা' ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'বালক'-এ প্রকাশিত হয়। কবির এ রচনা অলংকরণের কৃতিত্বও হরিশ্চন্দ্রের। দু' পৃষ্ঠাব্যাপী চিত্র ও অলংকরণের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্র “সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ” এবং “পারুল দিদির কচি মুখটি”-র যে চিত্র রচনা করেন তা তাঁর পূর্বের চিত্রগুলির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয়। ডান হাতের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র অঙ্কিত অলংকরণের মধ্যে কবির কবিতাটি পরিবেশিত হয় এবং কবিতার নীচে শিল্পীর সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর “বাই এইচ সি এইচ” দৃশ্যমান। বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় সাত ভাই চম্পা এবং এক বোন পারুলের পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র।

'বালক' আত্মপ্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ দু-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেওঘর থেকে ফেরার পথে গাড়িতে স্বপ্নের মধ্যে তাঁর এক গল্পের সূত্র সংগ্রহ। স্বপ্নলব্ধ সে সূত্রের সঙ্গে “ত্রিপুরার রাজ্য গোবিন্দ-মাণিক্যের পুরাবৃত্ত” মিশ্রিত করে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' রচনা। ধারাবাহিকভাবে 'রাজর্ষি'-রও আত্মপ্রকাশ 'বালক'-এ। 'রাজর্ষি'-র প্রথম কিস্তি সচিত্র না হলেও দ্বিতীয় কিস্তি থেকে (শ্রাবণ ১২৯২) সচিত্র করার দায়িত্ব হরিশ্চন্দ্রকেই দেওয়া

হয়। নববর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় কুটিরের দ্বারে সমাসীন জয়সিংহের এক পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্রের 'রাজর্ষি'-র রূপায়ণ শুরু।

"মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে, অত্যন্ত ঘনমেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দু নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোট ছোট শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।"—রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'-র এ বর্ণনার সঙ্গে যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে হরিশ্চন্দ্রের জয়-সিংহের রূপ রচনা।

পরবর্তী সংখ্যায় 'রাজর্ষি' অবলম্বনে হরিশ্চন্দ্রের যে কয়টি চিত্র প্রকাশিত হয় তার মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য এবং তাঁর ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের যুগ্মচিত্র উল্লেখযোগ্য। গোমতী তীরে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নির্জন অরণ্যের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য যে দৃশ্যে নক্ষত্র রায়ের হাতে নিজের তরবারি তুলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করছেন, সে দৃশ্যটি হরিশ্চন্দ্রের তুলিকায় চিত্রিত হয়ে 'বালক'-এ প্রকাশিত হয়। অঙ্কনরীতি এবং আকৃতি উভয় দিক থেকেই চিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃহৎ আকারের এ চিত্রটি কয়েকটি ভাঁজে 'বালক'-এ সংযোজিত হয়।

৫

কবির সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রতিভাসুন্দরী দেবী, হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনাও সচিত্র করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র। তিনি মানচিত্র অঙ্কনেও যে পারদর্শী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত 'বালক'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ) সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'বোম্বাই শহর' রচনার সঙ্গে মুদ্রিত "বোম্বাই দ্বীপের মানচিত্র"-এ সুস্পষ্ট।

সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই সম্পর্কিত অন্যান্য রচনার অন্তর্গত চাঁদবিবি এবং বোম্বাই-বাসী সস্ত্রীক পার্শি নাগরিকের চিত্রটিও হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চার নিদর্শন।

হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চার দৃষ্টান্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গেও সংযোজিত হয়। 'মুখ চেনা' শীর্ষক রচনার মাধ্যমে 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখালেখির শুরু। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর এ রচনার সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রটি প্রকাশিত হয় তার শিল্পী স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ রেখাচিত্র দুটির লিথোগ্রাফার হরিশ্চন্দ্র এবং তার প্রমাণ চিত্রে উৎকীর্ণ "লিথো বাই এইচ সি হালদার" কথাগুলির মধ্যেই নিহিত। তদুপরি 'মুখ চেনা' প্রবন্ধের এক স্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন

যে, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রের 'লিপিকর' বা লিথোগ্রাফার তিনি নন, অপর একজন। প্রমাণ স্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মুখ চেনা' রচনার সে অংশ উদ্ধৃত হলো (বৈশাখ, ১২৯২) ঃ

> "এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। রাজনারায়ণ বাবু ও বঙ্কিম বাবু। যাঁহার দাড়ি গোঁফ আছে তিনি রাজনারায়ণ বাবু, যাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান দেখিতেছ তিনি বঙ্কিমবাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর যে ছবি আঁকিয়াছিলাম লিপিকর তাহার ঠিক অনুসরণ করিতে পারে নাই, তাই বঙ্কিমবাবুর চোখ ও মুখের ভাব অবিকল হয় নাই।"

'বালক'-এ রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারুকলা চর্চার প্রথম ও শেষ নিদর্শন। তাঁর 'মুখ চেনা' রচনার পরবর্তী চিত্র দুটির স্রষ্টা হরিশ্চন্দ্র। 'বালক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মুখ চেনা' রচনাটি হরিশ্চন্দ্র রচিত একটি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রে সচিত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বক্তব্যকে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ এবং একটি হরিণের চোখের দৃষ্টান্তের সাহায্যে সচিত্র করেন স্বয়ং হরিশ্চন্দ্র। এ চিত্রে ইংরেজিতে খোদাই করা আছে "বাই এইচ সি হালদার।"

একইভাবে 'বালক'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৯২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মুখ চেনা' শীর্ষক তৃতীয় রচনাও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উইলিয়াম জোনসের (?) চিত্রের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেন শিল্পী হরিশ্চন্দ্র। কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন চিত্রগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের যে স্বাক্ষর বর্তমান তা লিথোগ্রাফার রূপে নয়—চিত্রকর রূপেই স্পষ্ট। অবশ্য চিত্রদুটির তিনিই লিথোগ্রাফার। কারণ হরিশ্চন্দ্র শিল্পী ও লিথোগ্রাফার দুইই ছিলেন। তদুপরি 'বালক'-এর মাসিক সূচীপত্রের অন্তর্গত চিত্রসূচীতেও চিত্রগুলির চিত্রকররূপে হরিশ্চন্দ্রের নামের উল্লেখ আছে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬) গ্রন্থেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। সেখানে সুস্পষ্টভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একমাত্র রাজনারায়ণ বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রের স্রষ্টা রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। —রামগোপাল ঘোষ এবং বিদ্যাসাগরের চিত্র দুটি সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতামত অনুচ্চারিত। অতএব 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-র সে অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> "বালকে প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণ বাবু, প্রভৃতি মহাত্মাগণের চরিত্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রাজনারায়ণবাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্তাঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।"

১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' গ্রন্থে 'বালক'-এ প্রকাশিত 'মুখ চেনা' প্রবন্ধগুলির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত এবং হরিশ্চন্দ্র খোদিত রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র এবং হরিশ্চন্দ্র অঙ্কিত ও খোদিত

রামগোপাল ঘোষ এবং বিদ্যাসাগরের দুটি পট অর্থাৎ সর্বমোট তিনটি চিত্রপট সংযোজিত হয়।

৬

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীও (১৮৬৫-১৯২২) 'বালক'-এর লেখক লেখিকা সূচীর অন্তর্ভুক্ত হন। সঙ্গীতে ও স্বরলিপি রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। পরবর্তীকালে বিচারপতি ও প্রাবন্ধিক-সমালোচক স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রতিভাসুন্দরী দেবীর সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কিত রচনা এবং স্বরলিপি পরিবেশন শুরু।

'বালক'-এর প্রথম সংখ্যায় 'সহজে গান শিক্ষা' এবং 'বল গোলাপ মোরে বল'-এর স্বরলিপি প্রতিভাসুন্দরী দেবীর প্রথম রচনা। এক্ষেত্রেও হরিশ্চন্দ্রের 'গ্রাফিক' বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রতিভাসুন্দরী দেবীর 'সহজে গান শিক্ষা' রচনার শীর্ষচিত্রেরও লিথোগ্রাফার তিনি।

'বালক'-এর পরবর্তী সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) প্রতিভাসুন্দরী দেবীর অপর এক স্বরলিপির সঙ্গে শিল্পী হরিশ্চন্দ্র নিজেকে এক চিরন্তন গৌরবের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছেন সবার অলক্ষ্যে। 'বালক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রথম ছয় চরণের যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয় তারও লিপিকার আশুতোষ-গৃহিণী প্রতিভাসুন্দরী দেবী। 'বন্দেমাতরম্'-এর স্বরলিপির সঙ্গে বহুসন্তান পরিবেষ্টিতা যে মাতৃমূর্তির চিত্র প্রকাশিত হয় তা সাহিত্যসম্রাটের 'বন্দে-মাতরম্'-এর প্রথম চিত্রায়ন (১৮৮৫)। বলা বাহুল্য, হরিশ্চন্দ্রই এ চিত্রের চিত্রকর এবং তাঁর কলানৈপুণ্যের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে 'বালক'-এর পৃষ্ঠায়। 'বন্দেমাতরম্'-এর এটিই প্রথম চিত্ররূপ। এ চিত্রের পূর্বে 'বন্দেমাতরম্'-এর, যা আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, কোন চিত্ররূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

৭

রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় এবং বাল্যসঙ্গী সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩) অঙ্কিত চিত্রেও 'বালক' শোভিত। কবির জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবী ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সত্যপ্রসাদের শিল্পীরূপে খ্যাতি ছিল। সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র হরিনারায়ণ বসুর কাছে সত্যপ্রসাদের চারুকলাচর্চা। হরিনারায়ণ বসু উইলিয়াম হেনরি জবিন্স এবং আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলের সময়ে সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর পরলোকগমনের পর আর্ট স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। এই হরিনারায়ণের কাছেই সত্যপ্রসাদের তৈল-চিত্রাঙ্কন শিক্ষা।

সত্যপ্রসাদের চারুকলাচর্চার দৃষ্টান্ত 'বালক'-এও বর্তমান। কিছু পরে হলেও সত্যপ্রসাদ হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে 'বালক'-এ রবীন্দ্ররচনা চিত্রায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সত্যপ্রসাদের চিত্রগুলি তাঁর নিজের নামের তিনটি আদ্য অক্ষর অর্থাৎ "স. প্র. গ." অথবা "এস· পি· জি·" দ্বারা চিহ্নিত।

'বালক'-এ সত্যপ্রসাদের প্রথম প্রকাশিত চিত্র 'দার্জিলিং' তাঁর নিজের রচনা 'দার্জিলিং যাত্রা'-র সঙ্গে মুদ্রিত হয় (বৈশাখ ১২৯২)। পরবর্তী অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' রচনাটি চিত্রায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' আত্মপ্রকাশ করলেও এ রচনার প্রথম চিত্রায়ন জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যুক্ত হয় এবং সত্যপ্রসাদ অঙ্কিত একটি চিত্রে দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মুকুট' সচিত্র। এই একটি ক্ষেত্রেই হরিশ্চন্দ্র ব্যতিক্রম—অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনিই রবীন্দ্ররচনা চিত্রায়নের সম্মানে সম্মানিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বালক'-এ সত্যপ্রসাদের নিজের অপর রচনা 'কাঞ্চন শৃঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এ রচনার সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর অঙ্কিত এক কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য। দার্জিলিং-এর অবজারভেটরি হিলে বসে আঁকা সত্যপ্রসাদের চিত্রটি তাঁর চারুকলাচর্চার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে 'বালক'-এ তাঁর আরও কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হয়।

৮

'বালক'-এ প্রকাশিত চিত্রগুলি হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চার খণ্ডস্মৃতি মাত্র। তবুও নিঃসন্দেহে বলা চলে তিনিই রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর। চব্বিশ বছর বয়সের কবির কবিতা ও অন্যান্য রচনার চিত্ররূপ দানের সম্মানে হরিশ্চন্দ্রই সম্মানিত। তত্ত্ব-বোধিনী, জ্ঞানাঙ্কুর, প্রতিবিম্ব, ভারতী এবং নবজীবনের পর 'বালক'-এর পৃষ্ঠায় যখন কবির রচনার প্রকাশ তখন তা চিত্রের মাধ্যমে প্রথম প্রস্ফুটিত হয় হরিশ্চন্দ্রের তুলিকায়।

'বালক'-এর কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং কবি এবং 'বালক' সম্পাদনার দায়িত্বও যে রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে বহন করেন তা এ যুগে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির দায়িত্ব সম্পর্কেও যে তিনি সচেতন ছিলেন একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ, প্রকাশের পূর্বে স্থির ছিল 'বালক' সচিত্র সাময়িক হবে। অতএব পারিবারিক উদ্যোগে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে তাঁর নিজের রচনা সচিত্র হবে কি হবে না নিশ্চয়ই তা রবীন্দ্রনাথের অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। 'বালক'-এ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনা যখন হরিশ্চন্দ্রের তুলিকায় চিত্রিত দেখি তখন এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে, চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও কবির সম্মতি ছিল; নচেৎ 'বালক'-এ হরিশ্চন্দ্রের চিত্ররচনার কোন সুযোগ ছিল না। যে যুগে হরিশ্চন্দ্রের চারুকলাচর্চা সে যুগের যে রীতি তাকে অবলম্বন করেই তাঁর চিত্রাঙ্কন এবং নিশ্চয়ই তা কবির অনুমোদন লাভ করেছিল। শিল্পী হিসেবেও হরিশ্চন্দ্রের নৈপুণ্য যে অকিঞ্চিৎকর নয় তা তাঁর চিত্রগুলি সাক্ষ্য দেয়।

৯

অনুসন্ধিৎসুর সর্বতোমুখী জিজ্ঞাসা নিয়েও রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকরের জীবনপঞ্জী উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। জানা গেল না তাঁর জন্ম-মৃত্যুর অকথিত কাহিনী। তবে এটুকু জানা গেল যে, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীটে তাঁর বসবাস ছিল। তার পিতা বলাইচাঁদ হালদার। হরিশ্চন্দ্র পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁর একমাত্র ভ্রাতার নাম গিরীশচন্দ্র।

অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং আরও অগণিত শিল্পীর সর্বাগ্রে যিনি দণ্ডায়মান তিনি পাথুরিয়াঘাটার হরিশ্চন্দ্র হালদার। রবীন্দ্র-রচনা রূপায়নের পথিকৃতের গৌরবে গৌরবান্বিত সেই শিল্পী হরিশ্চন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ম্যাজিকওয়ালা-নাট্যকার হয়েই বেঁচে রইলেন। কবির রচনায় তাঁর আর একটি পরিচয়, যা হরিশ্চন্দ্রকে পথিকৃতের মর্যাদা দান করে, তা চিরকালের মত অনুক্তই রয়ে গেল।

শশিকুমার হেশ

স্বনামধন্য তৈলচিত্রশিল্পী

উনিশ শতকে ইউরোপে শিক্ষায়তনের পরিবেশে বাঙ্গালী শিল্পীদের ললিতকলা অনুশীলনের যে সূচনা সে অধ্যায়ের পথিকৃৎ রোহিণীকান্ত নাগ। চিত্রশিল্পী রূপে রোহিণীকান্তর জীবন শুরু হলেও শেষে তিনি হয়েছিলেন ভাস্কর।

রোহিণীকান্তের পরে যে বাঙ্গালী শিল্পী ইউরোপে চারুকলা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তিনি শশিকুমার হেশ। রোহিণীকান্ত নাগের উত্তরসাধক শশিকুমার উনিশ শতকের আলোকে এক অবিস্মরণীয় নাম।

বহু পথ ঘুরে, বহুদিন পরে রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-র দরজায় যেদিন শশিকুমারের করাঘাত, সেদিন রোম সম্রাটের রাজকীয় চারুকলা শিক্ষায়তনে স্থান ছিল না। অতএব সুদূর প্রাচ্য থেকে আগত আশাবাদী শশিকুমারকে কোনো সাহায্যই 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-র কর্তৃপক্ষ করতে পারলেন না। ব্যর্থতার ইঙ্গিতে বিচলিত না হয়ে শশিকুমার কলকাতার ইতালিয়ান কনসাল-জেনারেলের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন সম্রাট প্রথম হামবার্টের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

"স্থান চাই রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে, ব্যবস্থা করে দিন আপনি। ফিরে যাওয়ার অর্থও নেই আমার।" —বিপন্ন শশিকুমারের নিবেদনের পুনরাবৃত্তি করেন সঙ্গের দোভাষী।

সৌম্যদর্শন শিল্পীর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হলেন শিক্ষাসচিব। অকপট-অন্তর শশিকুমারের আকুল আবেদনে সাড়া দিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ।—তবে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত-ভাবে নয়।

"আগামী তিন মাসের মধ্যে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে। যদি এই শর্তে রাজী থাকো তবেই বিশেষ ছাত্র হিসেবে 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-তে প্রবেশাধিকার পাবে তুমি।"

তিন মাস পরে শর্তাধীন সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শশিকুমার। মাত্র ছ' শ টাকা সম্বল করে তাঁর ইটালি যাত্রা। রোমে উপনীত শশিকুমারের হাতে তখন নব্বইটি মুদ্রা। ঊনবিংশ শতকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক ভারতীয় চিত্রশিল্পীর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার এক কাহিনী।

২

বিগত যুগে ললিতকলাকে অবলম্বন করে যে কয়জন মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী শিল্পী খ্যাতির চরম শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তাঁদের অন্যতম শশিকুমার। চারুকলার এক বিশেষ শাখায় অর্থাৎ 'পোর্ট্রেট' বা প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর কৃতিত্ব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে সুপরিচিত করে তোলে এবং তাঁর এই পরিচিতি ক্রমশ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছায়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন ঘটে, শশিকুমারের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে। তাঁকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নানা কিংবদন্তীর অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে শিল্পী শশি-

কুমারের প্রকৃত পরিচয়। ফলে, কলারসিকদের শশিকুমার প্রসঙ্গে নিস্তব্ধতা অবলম্বন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

৩

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার সাজিউড়া গ্রামে শশি-কুমারের জন্ম। তাঁর জীবনপ্রভাত চরম অনটন আর অভাবের ক্রন্দনরোলে সোচ্চার। তাই বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার অকিঞ্চিৎকর গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত ছিল তাঁর জীবন। জনৈক হৃদয়বান ভদ্রলোকের চেষ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতি। পণ্ডিতির সঙ্গে গোপনে ছবিও আঁকতেন শশী। কিন্তু কঠোর বাস্তব ছিন্ন-ভিন্ন করে দিত তাঁর সৃষ্টি। ছবি আঁকারও বিজ্ঞান আছে, আছে তার বিবিধ রীতিনীতি। ছবি আঁকতে প্রয়োজন হয় নানা উপকরণের। মাথা খুঁড়লেও তা পাওয়া যায় না সাজিউড়া গ্রামে। তাই যেতে চায় সে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে।

শশিকুমার খবর পেয়েছিলেন কলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলে লেখা-পড়ার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কলারশিপ পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সে বৃত্তি নিয়ে কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে এসে বাসা বাঁধলেন শশিকুমার। কয়েক মাসের মধ্যে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করে আর্ট স্কুলে পেয়েছিলেন আরও এক বৃত্তি।

আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট (প্রিন্সিপাল) উইলিয়াম হেনরি জবিন্স এবং তাঁর সহকর্মী ওলিণ্টো গিলার্ডি বিপুল এক সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন শশীর চিত্রকলার মধ্যে। অতএব তাঁরা উপদেশ দিলেনঃ ইটালি যাও। ধ্রুপদী ললিতকলার স্বর্গ ইটালি তোমার উপযুক্ত স্থান। ছাত্রবন্ধু ওলিণ্টো গিলার্ডি রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-র প্রসপেক্টাস আনিয়ে দিলেন। নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন কলকাতার ইতালিয়ান কনসাল-জেনারেলের সঙ্গে। উদ্দীপিত শশী অপরিসীম আনন্দে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ইউরোপে যাবার টাকা চাই।

এমন সময়ে পরিচয় হয় তাঁর মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের মাধ্যমে পরিচিত হলেন তিনি ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে। গুণগ্রাহী সূর্যকান্ত শশিকুমারকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

এই সময়ে ময়মনসিংহের দানশীলা ভূম্যধিকারী জাহ্নবী দেবী চৌধুরীর পরিবারের কয়েকটি প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ পেয়ে গেলেন শশিকুমার। সে বাবদ পারিশ্রমিক পান ছ'শ টাকা। এই ছ'শ টাকাই হলো তাঁর ইউরোপ যাবার পাথেয়। তারপর ভেসে পড়লেন সমুদ্রে। খৃষ্টাব্দ ১৮৯৪।

৪

রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-তে শশিকুমার তিন বছর পেণ্টিং-এর ছাত্র ছিলেন। এরপর জার্মানীর মিউনিক 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-তে স্পেশ্যাল পেণ্টিং ক্লাস-এর ছাত্ররূপে

যোগদান। মিউনিকে শশিকুমারের শিক্ষাকাল ছয় মাস। ইউরোপ প্রবাসের সময় কোনো বিপদে পড়তে হয়নি তাঁকে। কারণ, মহারাজা সূর্যকান্ত নিয়মিত টাকা পাঠাতেন শশীকে।

মিউনিকের শিক্ষা শেষে তিনি প্যারিসে উপনীত হন এবং প্যারিসেই প্রথম স্বাধীনভাবে তাঁর জীবিকা অর্জনের চেষ্টা।

প্রায় পাঁচ বছর পর যখন শশিকুমারের লণ্ডন যাত্রা তখন সেখানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডাবলিউ সি বোনারজি, দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ মানুষ।

শশিকুমারের প্রবল ইচ্ছা ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'-র শীতকালীন প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। কিন্তু তা হলো না। দেরি করে লণ্ডনে আসায় তাঁর সে বাসনা চরিতার্থ হয়নি।

কিন্তু শশীর গুণগ্রাহীরা ছাড়লেন না। তাঁদের উদ্যোগেই আয়োজিত হয় শশি-কুমারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সে অনুষ্ঠানের সংবাদ ধরে রেখেছে লণ্ডনের 'টাইমস'। "হিন্দু আর্টিস্টটিক এক্সপিরিয়েন্সএস" শিরোনামের সে সংবাদে বলা হয়েছে যে, লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট'-এ অনুষ্ঠিত সে সভায় শশিকুমারকে পেশ করতে হয়েছিল তাঁর ইউরোপ-বাসের অভিজ্ঞতা। প্রখ্যাত কলাসমালোচক স্যার জর্জ বার্ডউড-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে সভায় শশিকুমারের অভিজ্ঞতা পাঠ করেন ডক্টর শরৎচন্দ্র মল্লিক।

রোম, ফ্লোরেন্স, প্যারিসের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত ইউরোপীয় ধ্রুপদী চিত্রকলা তাঁর মনে যে ছায়াপাত করেছিল তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেন। প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান চিত্রকলার ক্রমবিবর্তনও তিনি নিপুণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

ইংরেজ শিল্পীদের শিল্পকর্মেরও আলোচনা তাঁকে করতে হয়েছিল এ বক্তৃতায়। সে আলোচনায় সার্জেণ্ট, হারকোমার, অর্কার্ডসন, কোলিয়ার প্রমুখ শিল্পীদের ললিতকলা চর্চা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, সার্জেণ্ট ছাড়া অন্য কোনো শিল্পীর কাজ তাঁর মনে ছায়াপাত করতে পারেনি।

৫

লণ্ডনের এই অনুষ্ঠানের কিছু পরে শশিকুমারের ভারত প্রত্যাবর্তন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় ফিরে আসেন শশিকুমার।

প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আচার্য ও অবলা বসু দুজনেই ছিলেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। স্বভাবতই বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহেই শশিকুমার এবং তাঁর ভাবী বধূর ব্রাহ্ম মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ।

শশিকুমারের পারিবারিক জীবনকে উপলক্ষ করে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আছে ভিত্তিহীন কিছু অবাস্তব এবং কাল্পনিক গাল-গল্পের প্রচলন। তাঁর সমসাময়িক-কালে শশিকুমার-সম্পর্কিত নানা সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভিত্তিহীন কিংবদন্তীর অবসান আজও হয়নি।

প্যারিসে থাকার সময়ে আতালি ফ্লামাঁ নামে জনৈকা ফরাসী বিদুষীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন শশিকুমার। পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ও ফ্লামাঁর সম্পর্ক নিবিড় প্রণয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। পরিণামে বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন দুজনে।

ফ্লামাঁ শশিকুমারের সঙ্গে প্যারিস থেকে লণ্ডনে আসেন এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে পাশ্চাত্য প্রথায় অনুষ্ঠিত হয় তাঁদের প্রাক্-বিবাহ বাগদান। রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং বিপিনচন্দ্র পাল তখন লণ্ডনে। এঁদের সঙ্গে শশিকুমারের সৌহার্দ্য ছিল। তাই এই তিন বরণীয় বাঙ্গালী শশিকুমার-আতালির প্রাক্-বিবাহ বাগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অপর দুই পরিদর্শক—ফ্লামাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ। ঘটনাকাল ১৮৯৯।

বাগদান অনুষ্ঠানের পর তাঁর ভাবী বধূর ভারতে আগমন। কিন্তু শশিকুমারের পরিবার ও সমাজ এই বিবাহের বিরোধিতা করায় তিনি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ভেঙ্গে যায় তাঁর বাসা বাঁধার স্বপ্ন। এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ভেঙ্গে পড়া শিল্পীকে অভয় দিলেন তিনি। মুহূর্তে সব ঠিক হয়ে গেল। — আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহেই ব্রাহ্ম মতাদর্শে দীক্ষিত হলেন শশিকুমার আর তাঁর ভাবী বধূ আতালি ফ্লামাঁ। মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারির এই অনুষ্ঠান সেদিনের পত্র-পত্রিকায় এক বিশেষ সংবাদ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শশী আর আতালি ফ্লামাঁর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশাধিকারের সংবাদ। ১৮২১ শকাব্দের ২ ফাল্গুন 'তত্ত্ব-কৌমুদী' তে লেখা হয়েছিল ঃ

"৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত ডাক্তার জে, সি, বসুর গৃহে ইটালী প্রত্যাগত প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস এবং কুমারী ফ্লেমেণ্ট এথেলী নাম্নী একটি ফরাসী রমণী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। নবজীবনদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর এই নবদীক্ষিতদিগের প্রাণে নবধর্মাগ্নি প্রদান করুন।"

৬

লণ্ডনে থাকার সময়ে বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও গায়কোয়াড়ের কাজ নিয়েছিলেন তিনি। তাই দেশে ফিরেও শশিকুমার তিন সপ্তাহের বেশি কলকাতায় থাকতে পারলেন না—চলে যেতে হলো তাঁকে বরোদায়। আতালি রয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে।

বরোদায় প্রায় দুমাস ছিলেন তিনি এবং এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক দীনেন্দ্রকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের বাংলা শিক্ষকরূপে তখন বরোদায় ছিলেন। পরবর্তীকালে দীনেন্দ্রকুমার শশিকুমারের বরোদা প্রবাস সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। 'সেকালের স্মৃতি' শীর্ষক দীনেন্দ্র-কুমারের সে আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ ও শশিকুমারের ঘনিষ্ঠতার বিবরণ প্রাপ্তব্য। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের মাসিক বসুমতীতে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন ঃ

"আমরা যখন বরোদায় ছিলাম, সেই সময় চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশ চিত্রশিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া য়ুরোপ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সুপারিশ-চিঠি লইয়া...বরোদায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বরোদার গায়কবাড় মহারাজা দাদাভাই নৌরজীর সেই সুপারিশ-চিঠি পাইয়া পরম সমাদরে শশিকুমারবাবুর অভ্যর্থনা করেন ; বরোদার গায়কবাড় মহারাজের একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত 'অতিথি-ভবন' (গেস্ট হাউস) আছে—সেই ভবনে শশিকুমারবাবুর বাসের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ... শশিকুমারবাবু বরোদায় আসিয়া এক দিন অপরাহ্নে আমাদের বরোদা ক্যাম্পের বাংলোয় উপস্থিত হইলেন, এবং অরবিন্দের সহিত পরিচিত হইলেন। কয়েক দিনের পরিচয়ে আমাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইল। শশিকুমারবাবু 'গেস্ট হাউসে' বাস করিবার সময় বরোদা সরকার হইতে প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ী পাইয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া তিনি নানাপথ ঘুরিয়া 'গেস্ট হাউসে' ফিরিয়া যাইতেন, এবং সন্ধ্যার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আলাপ চলিত।... শশিকুমারবাবু যে সময় বরোদায় গমন করিয়াছিলেন ; সেই সময় এক জন ইংরাজ চিত্রকর সিমলা-শৈল হইতে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সুপারিশ-চিঠি লইয়া কিছু কাজের চেষ্টায় বরোদায় আসিয়াছিলেন ; গায়কবাড় মহারাজা সেই ইংরাজ শিল্পীকে অনেকগুলি কাজের ভার দিয়াছিলেন, এ জন্য শশিকুমারবাবু সেখানে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই ; তবে মহারাজ তাঁহাকে কয়েকখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ; তাহা শেষ করিয়া তাঁহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা লইয়াই তাঁহাকে বরোদা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।"

পরবর্তীকালে মাসিক বসুমতীতে 'সে কালের স্মৃতি' শীর্ষক রচনায় দীনেন্দ্র-কুমার রায় দ্বিতীয়বার শশিকুমার-অরবিন্দ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত এ রচনায় শশিকুমারের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা ও চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন ঃ

"অরবিন্দের সহিত শশিকুমারের পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের নাম জানিতেন। শশিকুমারের পিতা সেকেলে গোঁড়া হিন্দু হইলেও, শশিকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন ; এবং তিনি অরবিন্দের মেসো শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ছিলেন। এজন্য প্রথম পরিচয়ের পর

তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।··· শশিকুমার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব অধিক ছিল। ফরাসী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় ফরাসী ভাষার ন্যায় অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন না,···দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল—চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতালাভের জন্য তিনি কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করিলেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁহার আগ্রহ ছিল না; ইংরেজের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজনীতি সংক্রান্ত অভিমতেও ফরাসী রাজনীতিকরাই তাঁহার গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল··· শশিকুমার ফরাসী কাব্য উপন্যাস সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, অরবিন্দ তাহার সমর্থন করিতেন। শশিকুমার সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টোর হুগোর যেরূপ প্রসংসা করিতেন; তাঁহার মুখে কোনদিন কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাই নাই।··· শশিকুমার রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনর্গল কত কথার আলোচনা করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অরবিন্দ সহিষ্ণুভাবে সকল কথা শুনিয়া যাইতেন, তিনি কদাচিৎ দুই একটি কথা বলিতেন; কিন্তু মতের অমিল হইলে শশিকুমার কোনদিন অরবিন্দের সহিত তর্ক করিয়া নিজের অভিমতের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। তিনি অরবিন্দের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। অরবিন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।···

তৈল-চিত্রাঙ্কনে শশিকুমার কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহার কোন পরিচয় পাই নাই; তবে যিনি প্যারিস, মিউনিক, ভিনিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান সাধকের সেই সাধনা ব্যর্থ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, একদিন তিনি লণ্ডনস্থ তাঁহার 'স্টুডিও' প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। কথায় কথায় একদিন তিনি বলিলেন, লণ্ডনের স্টুডিওতে তিনি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের (কিংবা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের, এতদিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না) একখানি পূর্ণাকৃতি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া এরূপ স্থানে রাখিয়াছিলেন যে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে সর্বপ্রথমে সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় না হইলেও সেই কক্ষে আলো-অন্ধকারের খেলা চলিতেছিল, আলো-অন্ধকারের সেই মিলনক্ষণে চিত্রার্পিত মূর্তি চিনিতে পারা যাইতেছিল। সেই সময় শুভ্র দাড়ি-গোঁফ, শুভ্রকেশ, পারসীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী বেড়াইতে বেড়াইতে শশিকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ চিত্রকর স্টুডিওতে আছেন শুনিয়া, তিনি স্টুডিওতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে দত্ত উপবিষ্ট। বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টির পক্ষে ছায়া ও কায়ার

পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইল, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দত্ত, আপনি এ অসময়ে এখানে ?'—শশিকুমার তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, তাঁহার তুলি আর কখনও এরূপ উচ্চ প্রশংসালাভ করিতে পারিবে না।...

শশিকুমার অতঃপর অরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি অরবিন্দের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিবেন, এজন্য তাঁহাকে দুই তিন বার 'সিটিং' দিতে হইবে। অরবিন্দ তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে অরবিন্দ 'গেস্ট হাউসে' আসিয়া দুই তিন দিন শশিকুমারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ে শশিকুমার সেই চিত্রখানি শেষ করিয়াছিলেন, এবং তুলির দুই এক টানে অরবিন্দের মুখের প্রসন্ন ভাবটি এরূপ চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, কোন সাধারণ চিত্র-শিল্পীর তুলিকায় তাহা অসাধ্য। শশিকুমারের আন্তরিক শ্রদ্ধার সেই উপহার অতীত স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপ অরবিন্দ পরবর্তীকালে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন কি কাহাকেও তাহা দান করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। বরোদা ত্যাগকালে তিনি তাহা দেশে লইয়া আসিয়া থাকিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্তরা সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়াছেন।"

৭

প্রায় দুই মাস পরে বরোদার মহারাজার পারিবারিক ছবি এঁকে শশিকুমার ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয় শশিকুমারের বিবাহ। জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে পাত্রী রয়ে গেলেন বৈজ্ঞানিকের বাড়িতে—পাত্র গেলেন শিল্পীবন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুকিয়া স্ট্রীটের আস্তানায়। তারপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বেনেটোলা লেনের সিটি স্কুলে হলো শশিকুমার ও আতালির মিলন। বিবাহের আচার্য ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বিবাহবাসরে ইউরোপীয় সমাজের অনেকে উপস্থিত থাকায় পণ্ডিত শিবনাথ বিবাহের কাজ ইংরেজি ভাষায় সম্পন্ন করেন।

তৎকালীন 'দি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' সংবাদপত্রে ধরে রাখা হয়েছে শশিকুমারের জীবনের সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠান। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল প্রকাশিত সে সংবাদে বলা হয়েছে ঃ

"An interesting ceremony of marriage was held last evening in the Hall of 45 Beniatolah Lane, of this city, between Mr. S. K. Hesh, the celebrated painter recently returned from Europe and Mademoiselle Flamant, a French lady, who has come out to this country with a view to being united to him. They made each others' acquaintance some two years back at Paris, and their attachment led to a formal engagement in London some months

ago, in the presence of Messrs R. C. Dutta, B. C. Pal, B. N. Sil and the brother and sister-in-law of the bride.

Mademoiselle Flamant then came out to this country and was a guest of Dr. J. C. Bose for several months. More than two months ago she was initiated into Brahmoism by Pandit Sibanath Sastri who has now joined them in holy wedlock. The hall was filled with a large crowd of guests, with a spirkling of European visitors. The service and sermon were in English. After the ceremony the guests were treated to refreshments..."

বিবাহের পরে নবদম্পতি বাসা বেঁধেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে। পরে উপেন্দ্রকিশোরই সুকিয়া স্ট্রীটে ঠিক করে দিয়েছিলেন ওঁদের নতুন বাসা। বরোদা থেকে ফিরে দীনেন্দ্রকুমার রায় গিয়েছিলেন শশিকুমারের নতুন বাসায়। তাঁর নতুন বাসা প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)ঃ

"শশিকুমারবাবু কলিকাতায় আসিয়া সুকিয়া স্ট্রীটে বাসা লইয়াছিলেন। আমি একদিন তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার ফরাসী পত্নীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছিল, সে ঠিক তাহার মায়ের মত হইয়াছিল। শশিকুমারবাবুও অতি সুপুরুষ; অরবিন্দ বলিতেন, তাঁহাকে দেখিলে ইটালিয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার শিল্প-দক্ষতার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাইব, কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত একখানি মাত্র চিত্র সেকালের 'প্রদীপ' নামক মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা একখানি পৌরাণিক চিত্র, স্মরণ হইতেছে, তাহা কুন্তীর চিত্র। বঙ্গদেশ এখন শশিকুমারবাবুকে বিস্মৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এখন তিনি মধ্য ভারতের কোন মিত্র-রাজ্যের চিত্রশিল্পীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার স্বদেশ বঙ্গদেশে তাঁহার অন্ন জুটিল না, বাঙ্গলার ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

৮

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিচারণে শশিকুমার অঙ্কিত যে কুন্তীর চিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে তা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার প্রদীপে'-এ প্রকাশিত হয়। সাদা ও কালো রঙে মুদ্রিত শশিকুমারের এই চিত্রের নাম 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী চিত্রটির ব্যাখ্যা করেন এবং তা প্রদীপ'-এর ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকায় শশিকুমার অঙ্কিত অন্য কোনো চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে দুটি-একটি প্রদর্শনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সিমলা ফাইন আর্টস সোসাইটির ঊনচল্লিশতম প্রদর্শনীতে

তাঁর "এ স্মল চাইনিজ বয় ষ্ট্যাণ্ডিং বাই এ লার্জ চাইনিজ ভাস" তৈলচিত্রটি 'মেসার্স শরীফ হোসেন বক্স' প্রদত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হয়।[১]

৯

বিবাহোত্তর জীবনে শশিকুমারের প্রথম ডাক আসে জোড়াসাঁকো থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখনও জীবিত — তাঁর ছবিও আঁকতে হবে তাঁকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শশিকুমারের বিশেষ গুণগ্রাহী, তাঁরই নির্দেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে চিরকালের জন্যে তৈলচিত্রে ধরে রাখলেন শশিকুমার (জুন, ১৯০০)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন এক সুযোগ। ছবি আঁকার অভ্যাস আছে তাঁরও, তাই শশিকুমার ও তাঁর স্ত্রী আতালিকেও এঁকে ফেললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আঁকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শশিকুমার ও তাঁর স্ত্রীর প্রতিকৃতি এখন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সম্পদ।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে শশিকুমারের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে 'দ্বিজেন্দ্র-নাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথ'-এর পোর্ট্রেটে। শশিকুমারের আঁকা দ্বিজেন্দ্রনাথের সে তৈলচিত্র দিনেন্দ্রনাথ দান করে গিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে। শশীর আঁকা 'রবীন্দ্রনাথ' এখন বিশ্বভারতীর সংগ্রহে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলা বসুও বাঙ্‌ময় হয়ে আছেন শশিকুমারের তুলিতে। হেমেন্দ্রমোহন বসুর প্যাস্টেল প্রতিকৃতি শশিকুমারের বৈচিত্র্যময় ললিত-কলা চর্চার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ডবলিউ সি বোনারজির পোর্ট্রেটও এঁকেছিলেন তিনি। শশিকুমারের 'ডবলিউ সি বোনারজি' সংগৃহীত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর 'শিবনাথ শাস্ত্রী' এখন আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। আচার্য শিবনাথের এ-পোর্ট্রেটে এক অপরিণামদর্শী শিল্পীর রঙ প্রয়োগের স্বাক্ষর বর্তমান। শশিকুমারের তুলির কাজ সেই অপরিণামদর্শী শিল্পীর রঙের নীচে বিলুপ্ত।

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রথারও প্রবর্তক। বেশি পরিমাণে রঙ ব্যবহারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ক্যানভাসের বিপরীত দিকে ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল তাঁর। আচার্য শিবনাথের তৈলচিত্র এ পদ্ধতির নিদর্শন।

মুখমণ্ডলের সঙ্গে নারী ও পুরুষের দেহের রূপলাবণ্যের প্রতিও শশিকুমারের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক্ষেত্রে তিনি রুবেন্স-এর অনুরক্ত।

কলকাতার মার্বেল প্যালেস-এ শশীর সর্বাধিক চিত্রসংগ্রহ বর্তমান। রোম ও মিউনিকে আঁকা দুটি অনিন্দ্যসুন্দর পূর্ণাবয়ব বিবস্ত্র 'নারী' ও 'পুরুষ'-এর চিত্র মার্বেল প্যালেস-এর বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া এখানে আছে তাঁর আঁকা 'রাশিয়ান নোবলম্যান' আর 'স্যার জর্জ বার্ডউড'।

[১] ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ: ১৪ আগস্ট ১৯০৬ দ্রষ্টব্য

লণ্ডন, বোম্বাই ও কলকাতায় আঁকা তাঁর চিত্রসূচীর অন্তর্গত আরও অনেকে। এ তালিকায় আছেন ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক, বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড রে, স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি, স্যার উইলিয়াম হাণ্টার, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, দাদাভাই নৌরজী, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, সন্তোষের কবি প্রমথনাথ চৌধুরী প্রমুখ মানুষ।

শশিকুমারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর পোর্ট্রেট ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের একাধিক চিত্রও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

১০

সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে শশিকুমার বাসা বেঁধেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ঝাউতলা রোডে। তাঁর দুটি সন্তানেরও জন্ম হয় কলকাতায়।

তারপর শশিকুমারের কথা কেউ জানে না, অথবা জানলেও কেউ বলেন না। হারিয়ে গেলেন তিনি অকস্মাৎ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট, ইনডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন হল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মার্বেল প্যালেস, ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ, আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল-এর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে রাখা বিপুল চিত্র-সম্ভারের স্রষ্টা শশিকুমার নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালেন সচল পৃথিবীর সরব সংসার থেকে। কোন্ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করলেন তার খবর কেউ রাখে না। কেউ বলেন আমেরিকায়, কেউ বলেন ফ্রান্সে। কিন্তু কোনো কথারই সঠিক প্রমাণ নেই, কোথায় গেলেন শশিকুমার আর আতালি। দিন যায়, যায় বছর—বাঙ্গলা দেশের মানুষ ভুলে যায় শশিকুমারকে। অনুসন্ধানী কিন্তু এখনও খুঁজে চলেছে শশিকুমারের আত্মনির্বাসন কোথায় এবং কেন?

ফণীন্দ্রনাথ বসু

রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির প্রথম
ভারতীয় অ্যাসোসিয়েট

খৃষ্টাব্দ ইতিহাসের প্রাতঃকালে যীশুমাতা মেরীর জ্ঞাতিভ্রাতা সাধু জন যীশুখৃষ্টকে পুণ্যতোয়া জর্ডন নদীর জলে 'ব্যাপটাইজড' করেছিলেন। ২৮ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলির সম্রাট হেরোদ দি ত্রেতার্কের নির্দেশে যীশুগুরু সাধু জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থে এই সাধু জন 'জন দি ব্যাপটিস্ট' নামে পরিচিত।

খৃষ্টানরা এ যুগে বিশ্বের একাধিক চার্চকে সেই জন দি ব্যাপটিস্টের নামে নামাঙ্কিত করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের সমৃদ্ধ জনপদ পার্থ শহরে আছে এমন এক প্রাচীন সেণ্ট জন চার্চ। সেই উপাসনাগৃহে সাধু জন দি ব্যাপটিস্টের যে পূর্ণাকৃতির ব্রোঞ্জ মূর্তিটি আছে তা বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসুর সৃষ্টি।

যীশুর দীক্ষাগুরু সাধু জনের সে অর্ধনগ্ন মূর্তিটি আজও অম্লান। সঙ্গে আছে ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ রচিত খৃষ্ট জীবন ও নিউ টেস্টামেণ্টের নানা আখ্যানের প্যানেল ও রিলিফ। বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের নানা শিল্পকর্মের নিদর্শন।

২

অবিশ্বাস আর বিশ্বাস দুই নিয়েই আমাদের এই বিপুল বিশ্ব। কৌতূহলী আমরা বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে তবুও আঁচড় কাটি সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। কখনও কখনও সে অনুসন্ধিৎসা সত্যি হয় বৈকি! এমন এক অবিশ্বাস্য প্রতিভার বিস্মৃত দৃষ্টান্ত বিক্রমপুরের ফণীন্দ্রনাথ বসু রায়চৌধুরী।

ঊনিশ শতকে সুদূর ইটালীতে কিশোর রোহিণীকান্ত নাগের উপস্থিতি ইউরোপে বাঙ্গালী শিল্পীর প্রথম পদসঞ্চারের সূচনা-মুহূর্ত। রোহিণীকান্তের পরে ইউরোপে দ্বিতীয় শিক্ষার্থী ময়মনসিংহের শশিকুমার হেশ। শশিকুমারের পরবর্তী যে বঙ্গসন্তান ললিতকলাকে অবলম্বন করে ইউরোপে যশস্বী হন তিনি ঢাকা-বিক্রমপুরের বহর গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ বসু।

'রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমি'-র প্রথম ভারতীয় 'অ্যাসোসিয়েট' ফণীন্দ্রনাথের কর্মজীবন স্কটল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করেই খ্যাত এবং স্কটল্যাণ্ডের পিবলস শহরে অর্ধবিকশিত জীবনের চিরসমাপ্তি। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনবৃত্তে যুগন্ধর ভাস্কর রোঁদ্যাও উপস্থিত। রোঁদ্যার সঙ্গে তাঁর খ্যাতির আঙ্গিনায় জ্যাকব এপস্টাইন, রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির সভাপতি জি ওয়াশিংটন ব্রাউন এবং খ্যাতনামা ব্রিটিশ ভাস্কর স্যার উইলিয়াম গোকম্ব জন আর. এ.-কেও দেখি। দেখি খ্যাত-অখ্যাত নানা ইউরোপীয় শিল্পী ও ভাস্করের আনাগোনা। যুগস্রোতে সে শিল্পীভাস্করগোষ্ঠীর কেউ আজ বিশ্ববিশ্রুত, কেউ বা বিস্মৃত।

ফণীন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমশীর্ষে আরোহণের পথ কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ নয়, নয় সহজ সরলরেখার মত তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির ইতিহাস। বহু বাধা, অসংখ্য কণ্টকে

আকীর্ণ পথে যেদিন তাঁর একাকী সমুদ্রযাত্রা সেদিন তিনি ষোড়শ বর্ষের কিশোর মাত্র। অবিচলনিষ্ঠ, কৃতনিশ্চয় ফণীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকাহিনী আজকের শিল্প-ইতিহাসে অনুচ্চারিত। ললিতকলাকে অবলম্বন করে তাঁর যেটুকু পরিচিতি তা সাগরপারের শিল্প আলোচনায় সীমাবদ্ধ। বিদেশের সে সমীক্ষায় ফণীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতা অপরিসীম। অপরিসীম সেই বিদেশী শিল্পী ও সমালোচক সমাজের শ্রদ্ধা। লণ্ডনের 'গ্র্যাফিক'-এর ভাষায় আজও ফণীন্দ্রনাথ "দি ফার্স্ট বেঙ্গলি টু গেইন ইণ্টারন্যাশনাল ফেম অ্যাজ এ স্কাল্পটার"।

৩

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২ মার্চ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বহর গ্রামে ফণীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতা তারানাথ বসু রায়চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ পিতামাতার পঞ্চম পুত্র।

পিতার কর্মস্থল রাজসাহী জেলার মহকুমা শহর নওগাঁয় ফণীন্দ্রনাথের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। নওগাঁর স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা এবং স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই তিনি চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। পশুপাখি, ফুল, লতা-পাতা আঁকার মাধ্যমেই বালক ফণীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসের ক্রমবিকাশ।

স্কুলের ছাত্র ফণীন্দ্রনাথের চারুকলা অনুশীলন যখন নিজ পথে নীরবে অগ্রসরমান তখন তাঁর যশস্বী ব্যারিস্টার পি মিত্রের সান্নিধ্যলাভ। ফণীন্দ্রনাথের আঁকা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এক চিত্র দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। ফলে, গুণগ্রাহী ব্যারিস্টার তারানাথ বসুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ছেলেকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করতে।

অতএব কলকাতার বউবাজারের জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে যেতে হল তাঁকে পিতৃনির্দেশে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রায় চোদ্দ বছর বয়সে রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তের জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে ফণীন্দ্রনাথের প্রবেশ। সেখানে মাত্র পাঁচ মাস চারুকলা অনু-শীলনের পর এলেন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল তখন সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল। এক বছরের মধ্যেই সম্ভাবনাপূর্ণ কিশোর ফণীন্দ্রনাথ পড়ে গেলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী ইতালিয়ান অধ্যক্ষ ওলিণ্টো গিলার্ডি তাঁকে দিলেন ইটালি যাবার পরামর্শ। যেমন দিয়েছিলেন তিনি শশিকুমার হেশকে। ছবি এঁকে ফণীন্দ্রনাথের আংশিক পাথেয়ও যোগাড় হল রাজসাহী জেলার দুবলহাটির রাজার ছেলেদের বদান্যতায়। সঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁরা মাসিক পঁচাত্তর টাকার প্রতিশ্রুতি। তারপর ষোল বছরের কিশোর একাকী ভেসে পড়লেন আরব সাগরে। উদ্দেশ্য—ইটালিতে ললিতকলা অনুশীলন। খৃষ্টাব্দ ১৯০৪।

কিন্তু ইটালিতে নয়, চলে গেলেন আরও পশ্চিমে—ইংল্যাণ্ডে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রিন্সিপাল গিলার্ডির নির্দেশ: ইংল্যাণ্ডে যাও তুমি, কিছু ইংরেজি তোমার জানা আছে

—সুবিধা হলে সেখানেই হবে। ইটালিতে অনেক অসুবিধা। তাছাড়া ইটালিয়ানও শিখতে হবে তোমাকে।

লণ্ডনে পৌঁছে ফণীন্দ্রনাথ 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থান হয়নি। বিনা বেতনে ভর্তি হবার সুযোগ না পেয়ে ভগ্ন-মনোরথ কিশোর চলে যান এডিনবরায়।

এডিনবরার 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশান' সাদরে টেনে নিয়েছিলেন কিশোর ফণীন্দ্র-নাথকে। এডিনবরার 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশান' থেকে 'এডিনবরা কলেজ অব আর্ট'-এ উঠে আসেন ফণীন্দ্রনাথ। এ ঘটনা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের। এডিনবরার আর্ট কলেজ তাঁর সে তপস্যায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন 'বার্সারি' দিয়ে। চিত্রশিল্পী নয়, এইখানেই পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে যায়, ফণীন্দ্রনাথ হবেন ভাস্কর। সেদিন থেকে তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক-ভাস্কর পার্শি পোর্টসমাউথ, এ. আর. এস. এ। তিন বছর পর সাফল্যের সঙ্গে আর্ট কলেজের ছাড়পত্র নিয়ে স্মিতহাস্যে যেদিন বেরিয়ে এলেন ফণীন্দ্রনাথ সেদিন হাতে ছিল তাঁর অতিরিক্ত পাওনা 'স্টুয়ার্ট প্রাইজ'। একথা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের। 'এডিনবরা কলেজ অব আর্ট'-এর পার্শি পোর্টসমাউথের এই সুযোগ্য ছাত্রকে 'ট্রাভেলিং স্কলারশিপ' দেয় এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়। ১০০ পাউণ্ডের সেই স্কলারশিপের সঙ্গে তদানীন্তন ভারত-সচিবের নির্দেশে দেওয়া বাংলা সরকারের মাসিক বৃত্তিও ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দেই পূর্ব ইউরোপ যাত্রা ফণীন্দ্রনাথের। এক বছরের সে সফরে তাঁর ইটালি ও ফ্রান্স ভ্রমণ। সফরের শেষ পর্যায়ে ছিলেন তিনি প্যারিসে। এইখানেই সাক্ষাৎ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোঁদ্যার সঙ্গে। বৃদ্ধ রোঁদ্যা তরুণ ফণীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সানন্দে সম্মতিও দিয়েছিলেন তিনি। তোমার শিক্ষার যদি কিছু থাকে তবে তা নিশ্চয়ই পাবে আমার কাছে। বিক্রম-পুরের ফণীন্দ্রনাথ থেকে গেলেন 'ওতেল বিরং'-এ। সেখানেও চলে তাঁর আরও শেখার সাধনা।

এডিনবরায় ফিরে এসে স্টুডিও স্থাপন করেন ফণীন্দ্রনাথ। পেশাদারী ভাস্কর্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁর প্রথম অংশ গ্রহণ। পরের বছর অংশ নিয়েছিলেন লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে। তাঁর রচিত 'দি বয় অ্যাণ্ড দি ক্র্যাব' আর 'দি হাণ্টার' প্রদর্শিত হয় লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরেই রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে এসেছিলেন স্যার উইলিয়াম গোকম্ব জন। প্রখ্যাত ভাস্কর স্যার উইলিয়াম গোকম্ব জন মুগ্ধ হয়ে কিনে নিয়েছিলেন তাঁর 'দি হাণ্টার'।

বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গায়কোয়াড় তখন ব্রিটেনে। ভাস্কর স্যার উইলিয়াম গোকম্ব জনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। সেই সূত্রে স্যার উইলিয়ামের

বাড়িতে গিয়েছিলেন সায়াজীরাও। তাঁর ড্রইংরুমে নানা পাথর আর ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে দেখতে পান তিনি ফণীন্দ্রনাথের 'হাণ্টার'। কথাপ্রসঙ্গে যখন জানতে পারলেন যে হাণ্টারের রচয়িতা একজন ভারতীয়, তখন বিস্ময়বোধ করেন সায়াজীরাও গায়কোয়াড়। গুণগ্রাহী সায়াজীরাও এডিনবরায় ফণীন্দ্রনাথের স্টুডিওতেও গিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর চাই ঐ হাণ্টারের একটা 'রেপ্লিকা'। বরোদার আর্ট গ্যালারিতে রাখতে চান সায়াজীরাও ঐ 'হাণ্টার'। সানন্দে রাজী হয়েছিলেন ফণীন্দ্রনাথ এবং নতুন করে করে দিয়েছিলেন দ্বিতীয় এক 'হাণ্টার' বরোদার আর্ট গ্যালারির জন্যে। এছাড়াও দ্বিতীয় এক দায়িত্ব ফণীন্দ্রনাথকে নিতে হয়েছিল সায়াজীরাও-এর অনুরোধে। বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস গার্ডেনের জন্যে ব্রোঞ্জের আটটি মূর্তি চাই। সায়াজীরাও-এর এ অনুরোধও রেখেছিলেন তিনি।

৪

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সায়াজীরাও-এর অনুরোধ রাখতে অল্প কয়েকদিনের জন্যে বরোদায় এসেছিলেন ফণীন্দ্রনাথ। কিন্তু ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের অসুবিধা দেখায় ফিরে চলে যান তিনি এডিনবরায়। সেখান থেকে গায়কোয়াড়ের কাজ করেছিলেন তিনি। আজও বরোদায় আছে ফণীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যের বিবিধ নিদর্শন।

উত্তরকালে অর্ধশতাব্দীর রাজ্যকাল পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সায়াজীরাও তাঁকে 'রাজশিল্পকর' খেতাবে সম্মানিত করেছিলেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষ' সাময়িকপত্রে তাঁর সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে লেখা হয়েছিল ঃ

"বরোদার গাইকোয়ার মহোদয়ের রাজ্যকাল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় যে উৎসব হয় তদুপলক্ষ্যে আমরা ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সম্মান লাভের কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম; কিন্তু উক্ত উৎসব উপলক্ষে আরও একজন বাঙ্গালী যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করায় আমাদের ত্রুটী হইয়াছে। এবার সে ত্রুটী সংশোধন করিতেছি। এই বাঙ্গালী মহাশয়ের নাম শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ভাস্কর। ইনি অল্পদিন পূর্বে রয়েল স্কটিশ একাডেমির (Royal Scottish Academy) এসোসিয়েট (Associate) নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোন ভারতীয় ভাস্কর এত বড় সম্মান পান নাই। গাইকোয়ার মহোদয় ইঁহাকে 'রাজ-শিল্পকর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন; আড়াই হাজার টাকা সম্মান-স্বরূপ দিয়াছেন এবং পাঁচ বৎসরকাল মাসিক একশত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।"

৫

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাড়ি কিনে ফণীন্দ্রনাথ স্থায়ী হন এডিনবরায়। এই সময়ে
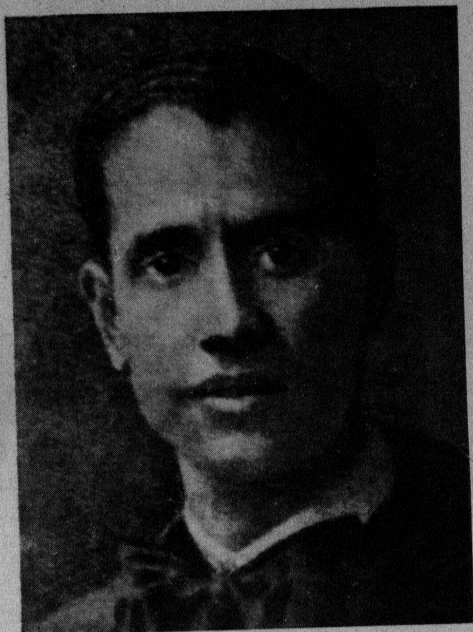
ফণীন্দ্রনাথ বসু
(১৮৮৮—১৯২৬)
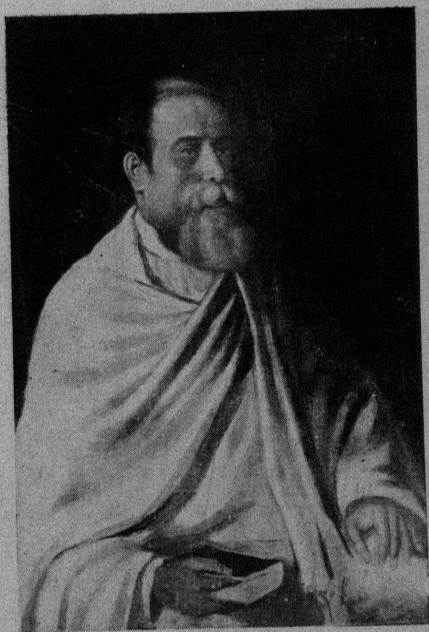
শশিকুমার হেশ অঙ্কিত
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (তেল)
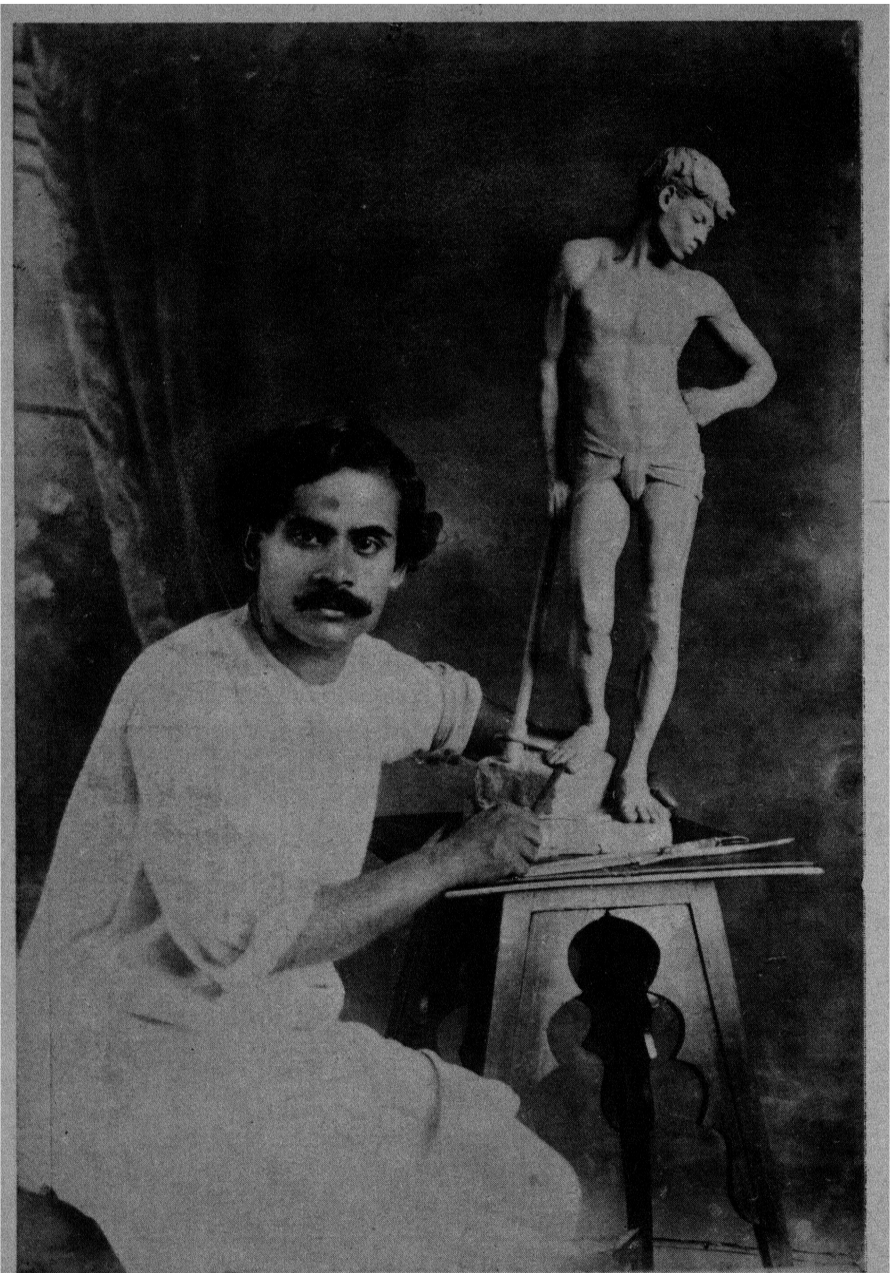
প্রমথনাথ মল্লিক ও তাঁর ভাস্কর্য 'সোল অব দি সয়েল'- (প্ল্যাস্টার)

ডাণ্ডির জনৈকা বিদুষী মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহোত্তর জীবন তাঁদের সুখেরই ছিল।

ফণীন্দ্রনাথের জীবন ও ভাস্কর্যকলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের 'মানসী ও মর্মবাণী' সাময়িকপত্রে 'বাঙ্গালার ভাস্কররাজ ফণীন্দ্রনাথ বসু' রচনায় ফণীন্দ্রনাথের বিবাহ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন ঃ

"বিলাতে থাকিতেই ফণীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে ডাণ্ডি নগরের একটি গৃহস্থ পরিবারের কন্যা মিসেস মলিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মহিলার কথা যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যায় যে ফণীন্দ্র তাঁহাকে লইয়া সুখেই সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন।"

নতুন দিল্লির অলংকরণের জন্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আর্কিটেক্ট মনোনীত হয়েছিলেন ফণীন্দ্রনাথ। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'কমিশন' দেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দুটি প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পার্থ-এর সেণ্ট জন চার্চের অলংকরণ। রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমিতে তাঁর স্বীকৃতি একমাত্র এই কারণে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ ডাব্লিউ এস ফ্রেজারের সভাপতিত্বে রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমি অভিজ্ঞান-পত্র তুলে দেয় ফণীন্দ্রনাথের হাতে। সেদিন থেকে তিনি রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির 'অ্যাসোসিয়েট'। অর্থাৎ এ. আর. এস. এ.—অ্যাসোসিয়েট অব দি রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমি।

স্কটিশ অ্যাকাডেমির দীর্ঘ তালিকায় তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং নির্বাচনে ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন গ্ল্যাসগোর খ্যাতনামা ভাস্কর বেম্রোসেজ। নির্বাচনে ফণীন্দ্রনাথের পক্ষে ভোট ছিল ৩১—বিপক্ষে ৮। এডিনবরার 'স্কটসম্যান' ধরে রেখেছে সে খবর। পরের দিন ফণীন্দ্রনাথের নির্বাচন প্রসঙ্গে 'দি স্কটসম্যান' লিখেছিল ঃ

"His (Bose's) statuetts are the work by which he is best known and the celebrated Rodin was much impressed by them .. His election is a recognition of the fact that art at its best transcends nationality."

কিঞ্চিদধিক এক বছর পরে কলকাতার দুই বিদেশী পরিচালিত ইংরেজি সংবাদপত্রে অকস্মাৎ স্পেশ্যাল কেবল্-এর কপিরাইট নামাঙ্কিত সচিত্র সংবাদে মুদ্রিত হয়ে গেল ঃ "এফ এন বোস ডেড। ডেথ অব এ বেঙ্গল স্কাল্পটার"। ব্রিটেনে বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসুর জীবনাবসান।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১ আগস্ট মাত্র সাঁইত্রিশ বছর পাঁচ মাস বয়সে স্কটল্যাণ্ডের পিবলস শহরে ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমন। লণ্ডনের 'টাইমস'-ও ছেপেছিল সে খবর। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ আগস্ট 'টাইমস'-এ লেখা হয়েছিল ঃ

"The death has occurred at Peebles of Mr. Fanindra Bose,

the sculptor...During recent years he had exhibited a number of works at the Royal Academy and the Royal Scottish Academy."

সঙ্গে কলকাতার 'ইংলিশম্যান' ও 'স্টেটসম্যান'-এও মুদ্রিত হয়েছিল সে সংবাদ। কিন্তু কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশ করা হয়নি তাঁর পরলোকগমনের কারণ।

বিদেশে বিলুপ্ত ফণীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষে আর কোনদিন ফেরা হয়নি। দেখা হয়নি তাঁর পিতামাতার সঙ্গে। প্রচণ্ড এক অভিমান নিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন তিনি। অজ্ঞাত অভিমান-অভিভূত সেই শিল্পীর সাধনা তবুও অব্যাহত ছিল। ফণীন্দ্রনাথের শিল্পস্বাক্ষর আজও বহন করে চলেছে পার্থ-এর সেই সেণ্ট জন চার্চ। বিদেশী, বিধর্মীর সে শিল্পসম্ভারকে বুকে নিয়ে খৃষ্ট-উপাসনার উপচার আজও সাজানো হয় সেখানে প্রতিদিন। বিপুল জলরাশি আর বিস্তৃত ভূখণ্ডের ওপারে এখনও সেই 'জন দি ব্যাপটিস্ট' আপন মহিমায় দণ্ডায়মান। সেণ্ট জন চার্চে আগত খৃষ্ট-উপাসকদের অনেকেই সে কথা জানেন না। আমরা তো অনেক দূরের মানুষ। কোথায় পার্থ, কোথায় এডিনবরা, কোথায় বিক্রমপুর বহর রাজসাহী আর নওগাঁ!

প্রমথনাথ মল্লিক

কৃতী ভাস্কর

এক নজরেই ভালো লেগে গেল সুভাষচন্দ্রের। তবুও এদিক-ওদিক থেকে আর একবার দেখে নিলেন মূর্তিটি। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভাস্করের দিকে চেয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, এটিই আমি নিয়ে যাবো। খুশি হয়েছি আপনার ভাস্কর্য দেখে।

পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র নিজে। অধিবেশন-মণ্ডপের প্রবেশপথে স্থাপিত হবে পরলোকগত চিত্ত-রঞ্জনের এক স্মৃতি-বেদী। সুভাষচন্দ্রের খুব ইচ্ছে সেই স্মৃতি-বেদীতে দেশবন্ধুর এক মূর্তি থাকবে। দেশবন্ধুর মানসপুত্র তাই নিজেই খুঁজতে বেরিয়েছেন চিত্ত-রঞ্জনের মূর্তি। দেখলেন কয়েকটি, কিন্তু পছন্দ হলো না একটিও। এমন সময় শুনলেন প্রমথ মল্লিকের কথা। তাই এসে হাজির হয়েছেন প্রমথনাথের বাড়িতে।

সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে দেশবন্ধুর সেই আবক্ষ মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অধিবেশন-মণ্ডপের দেশবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভে। প্রমথনাথের পাওয়া অগণিত পুরস্কার আর মানপত্রের মধ্যে দেশবন্ধুর সে মূর্তিটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এক স্মরণীয় অধিবেশনের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনও বর্তমান।

কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীর প্রচলন বহুদিনের। সেবারের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণও করেছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর ছোটবড় তেরটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে দেখে ব্যাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান লেবার রিভিয়্যু'-এর সম্পাদক আর্নেস্ট কার্ক তুলেছিলেন কয়েকটি ফোটো। গুণগ্রাহী কার্ক এক ইতালীয় কলারসিকের মতামত জানার জন্যে তাঁকে দেখিয়েছিলেন ফোটোগুলি। প্রথম দর্শনেই ইতালীয় রসিক বলেছিলেন যে, ভাস্কর্যগুলি নিঃসন্দেহে কোন ইউরোপীয় ভাস্করের কাজের নমুনা। প্রত্যুত্তরে, পরের সংখ্যায়, 'ইণ্ডিয়ান লেবার রিভিয়্যু'-এর প্রচ্ছদে প্রমথনাথের 'সোল অব দি সয়েল' ভাস্কর্যটির ছবি মুদ্রিত করে ইতালীয় ভদ্রলোকের প্রতীতির অবসান ঘটিয়েছিলেন আর্নেস্ট কার্ক।

২

বিশ্বের তাবৎ দেশের ললিতকলা চর্চার ইতিহাসে এক অদ্ভুত পারম্পর্য আছে। সেটি হচ্ছে ভাস্করদের তুলনায় সব দেশে, সব যুগে, চিত্রশিল্পীর সংখ্যা অধিক। এ সাদৃশ্যের ইতরবিশেষ বঙ্গদেশেও হয়নি। বঙ্গদেশেও ভাস্করেরা চিরকালই সংখ্যালঘু। হাতে গুণে বলা যায় এদেশে কয়জন ভাস্কর ছিলেন বা আছেন।

আধুনিক যুগের ভাস্কর্যকলায় যে বঙ্গসন্তান পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন তিনি ঢাকার বারদী গ্রামের রোহিণীকান্ত নাগ। ধ্রুপদী ভাস্কর্যের আকর্ষণে উনিশ শতকে রোমে তাঁর ভাস্কর্য অনুশীলন। যক্ষার নিষ্ঠুর আক্রমণে মাত্র সাতাশ

বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। কর্মজীবনের সীমিত বৃত্তে ইউরোপে তাঁর যে ভাস্কর্য রচনা তা বোধ হয় কোনোদিনই এদেশে এসে পৌঁছয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কবিপুত্র অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রোহিণীর ভাস্কর্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অর্থব্যয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টি এদেশে এসে পৌঁছেছিল কী না তার সংবাদ দুর্লভ।

রোহিণীকান্তের পরে বিদেশে পা বাড়িয়ে যে দ্বিতীয় বাঙ্গালী বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি বিক্রমপুরের বহর গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ বসু। জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি এবং সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ফণীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য শিক্ষা এডিনবরায়। রোঁদ্যা-র সান্নিধ্যে-আসা ফণীন্দ্রনাথ 'রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমি'-র অ্যাসোসিয়েট হয়েছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের পিবলস শহরে তাঁর পরলোকগমন ঘটে।

ফণীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে তৃতীয় যে বঙ্গসন্তান ভাস্কর্য রচনায় তৎকালীন সমাজে কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি ময়মনসিংহের নোয়াপাড়া গ্রামের কৃষ্ণকমল বর্মণ রায়ের পুত্র অশ্বিনীকুমার বর্মণ। স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টিনের বন্ধু অশ্বিনীকুমারও তাঁর দুই পূর্বগামীর মত ইউরোপকেই করেছিলেন কর্মক্ষেত্র। ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী অশ্বিনীকুমারের ভাস্কর্যচর্চার যে সামান্য বিবরণ এদেশে পৌঁছেছিল তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, তিনিও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভাস্কর্যকলায়। ইউরোপ থেকে প্রবাসী সাহিত্য ভারতবর্ষে পরিবেশন করেছেন ভাস্কর্যকলা সম্পর্কিত নানা রচনা। স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টিনের চিত্রকলার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকসমাজের তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন বাংলা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। প্রথমে ব্রাডফোর্ড, পরে লণ্ডনে তাঁর বসবাস। সম্ভবত, তাঁরও ফেরা হয়নি ভারতবর্ষে।

বাঙ্গালীর ভাস্কর্য চর্চার চতুর্থ প্রতিনিধি স্বনামধন্য হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর ইউরোপ যাত্রা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। লণ্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'-এ এডোয়ার্ড ল্যানটেরির অধীনে শিক্ষা সমাপ্তির পর রয়্যাল কলেজের 'অ্যাসোসিয়েট' হয়ে দেশে ফিরেছিলেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। তিনিই 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'-এর প্রথম ভারতীয় 'অ্যাসোসিয়েট' (এ আর সি এ)। বাংলার বাইরে, বিশেষত উত্তর প্রদেশেই, তাঁর ভাস্কর্যের নিদর্শন সহজলভ্য। কারণ, প্রথমে জয়পুরের মহারাজার আর্ট স্কুলে এবং পরে লখনৌর সরকারী আর্ট স্কুলে কেটেছে তাঁর শিক্ষাব্রতীর জীবন।

এ'দের পরে যাঁর নাম অনায়াসে করা যায়, তিনি প্রমথ মল্লিক। প্রমথ মল্লিকের সঙ্গে অবশ্য আরও একটি নামের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। একই যুগে ভাস্কর্যকলাকে অবলম্বন করে দেবীপ্রসাদ ও প্রমথনাথের আত্মপ্রকাশ হলেও অভিজ্ঞতা ও বয়সে প্রমথনাথ অগ্রজ। বয়সে পাঁচ বছরের জ্যেষ্ঠ প্রমথ মল্লিকের ক্রমপর্যায় স্বভাবতই দেবীপ্রসাদের আগে। তবে বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও খ্যাতির পরিধি দেবীপ্রসাদের যতটা বিস্তৃত, ততটা প্রমথনাথের নয়। রোহিণীকান্ত থেকে হিরণ্ময় এই চার পুরুষের তিনি ব্যতিক্রমও বটে। কারণ,

তাঁর পূর্বগামীদের সকলেরই ভাস্কর্য অনুশীলন বিদেশে। প্রমথনাথের উত্তরণের ইতিহাস কিন্তু স্বদেশেই।

৩

১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৮৯৪) কলকাতার এক প্রাচীন পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা যতীন্দ্রনাথ, মাতা মনোরমা দেবী। ছেলেবেলায় যেমন সকলের ছবি আঁকায় ঝোঁক থাকে, তেমনি তাঁরও ছিল। স্কটিশ চার্চ স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে চলত চারুকলার অনুশীলন। শেষে চারুকলার আকর্ষণে ভর্তি হয়ে গেলেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা। ই বি হ্যাভেলের বিদ্রোহী ছাত্র রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত সরকারী আর্ট স্কুল ছেড়ে গড়ে তুলেছিলেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি। কুইন ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলির বছর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে স্কুলের নামের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল 'জুবিলি' কথাটি। বৈঠকখানা রোডের এই আর্ট অ্যাকাডেমিতেই এক সময় ছাত্র ছিলেন ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু। বিগত যুগের বিশিষ্ট শিল্পী নরেন্দ্রনাথ সরকারেরও চিত্রবিদ্যা অনুশীলন এখানে। সরকারী আর্ট স্কুল ছেড়ে আর এক বিদ্রোহী ছাত্র হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারও এসে-ছিলেন বৈঠকখানার এই বাড়িতে। প্রতিভাধর প্রতিকৃতি-শিল্পী অতুল বসুরও চিত্রবিদ্যার হাতে-খড়ি জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। শিল্পী অভয়চরণ দাসরায়, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকারও কোনো না কোনো সময়ে এখানেই ছাত্র ছিলেন।

চিত্রাঙ্কনের চেয়ে মূর্তি গড়ার আসক্তি দেখে প্রমথনাথকে রণদাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন মডেলিং ক্লাসে। সেখানে তিনি নিজেই শেখান কী করে গড়তে হয় মাটির মূর্তি। ক্রমশ প্ল্যাস্টারের ছাঁচ তোলাও করায়ত্ত হলো জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। নিয়মিত চার বছর যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দিলেন স্কুলে যাওয়া-আসা। তখন বাড়িতে বসেই মূর্তি গড়েন আর মূর্তি ভাঙেন। এমন সময়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিলেন দুটি প্ল্যাস্টার রিলিফ। জহুরী অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে যায় নাম-না-জানা ভাস্করের সে-কাজ দুটি। অবনীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে একদিন এক ভদ্রলোক নিয়ে এসে হাজির করলেন তরুণ ভাস্করকে দাদা-ভাইয়ের কাছে। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল প্রমথনাথের অতৃপ্তির কথা। 'শেখা শেষ হয়নি, আরো শিখতে চাই। মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়।' হৃদয়বান গগনেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন প্রমথনাথের অন্তর্জ্বালা। অতএব অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে গেলেন তাঁকে বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমার-কারের বাড়িতে। কারমারকার তখন কলকাতার বাসিন্দা। গগনেন্দ্রনাথের অনুরোধে সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। প্রায় সমবয়সী গুরু পেয়ে প্রমথনাথও খুশী।

৪

মহারাষ্ট্রের প্রথিতযশা ভাস্কর বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকারের (১৮৯১—১৯৬৭) কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় কেটেছে কলকাতায়। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে তাঁর কলকাতা আগমন (১৯১৪) এবং সুরেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ। এই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি ছেড়ে পরে ঝাউতলা রোডে তাঁর বসবাস শুরু। সে সময়ে বহু বাঙালী বিদ্বজ্জনের প্রতিমূর্তি তিনি রচনা করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ডঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাধাচরণ পাল (কৃষ্ণদাস পালের পুত্র), অবনীন্দ্রনাথ এবং শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূর্তিগুলি কারমারকারের কলকাতা বসবাসকালেই রচিত হয়।

বছর দুয়েক কারমারকারের কাছে প্রমথনাথের ভাস্কর্য অনুশীলন। আগে পাথর খোদাই জানতেন না—শিখেছিলেন তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ভাস্কর্য সম্পর্কে আধুনিকতম শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কারমারকারের ইউরোপ যাত্রা (১৯২০)। তিন বছর পর পুনরায় যখন তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তন তখন প্রমথনাথের আবার যাওয়া-আসা শুরু তাঁর কাছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারে তাঁর বেশি দিন থাকা হলো না কলকাতায়। কোলহাপুরের মহারাজার আমন্ত্রণ এবং পুনার অশ্বারোহী শিবাজীর ব্রোঞ্জ মূর্তি রচনার জন্য তাঁর বোম্বাই প্রত্যাবর্তন। কারমারকার শিবাজীর মূর্তি রচনার প্রধান সহকারী হিসেবে প্রমথনাথকে বোম্বাই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রমথনাথ এক কথায় রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রকে বোম্বাই যাবার অনুমতি দিলেন না স্নেহান্ধ পিতা। ফলে বহির্জগতের বৃহত্তর পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ তাঁর আর হলো না। তার থেকেও তাঁর বড় ক্ষতি হলো, ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। কারমারকার পুনার যে অশ্বারূঢ় শিবাজীর মূর্তি রচনার ভার পেয়েছিলেন তা ব্রোঞ্জের চৌদ্দ ফিট উঁচু মূর্তি। ইংল্যাণ্ড যাবার আগে কারমারকার প্রধানত মার্বেল এবং প্ল্যাস্টারের মাধ্যমেই রচনা করতেন তাঁর ভাস্কর্য। রয়্যাল অ্যাকাডেমি থেকে ব্রোঞ্জ ঢালাই শিখে আসার পর তাঁর উল্লেখযোগ্য ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য শিবাজীর মূর্তি। প্রমথনাথের আশা ছিল গুরুর সহকারীরূপে শিবাজীর মূর্তি রচনাকালে প্রতিটি অধ্যায়ের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, নিজের হাতে বড় কাজে সাহায্যের সুযোগও তাঁর হবে। কিন্তু পিতার নির্দেশে সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

৫

পরবর্তীকালে নিজের অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সম্বল করেই তাঁর মানসসিদ্ধির সংগ্রাম। প্রমথনাথের ভাস্কর্য চর্চার সে-অধ্যায় সমকালীন শিল্পী ও ভাস্করদের অজ্ঞাত হলেও পঞ্চাশোর্ধ্ব যে-কোনো বিদগ্ধের স্মৃতিতে তিনি অম্লান। তাঁর

প্রমথ মল্লিকের ভাস্কর্য 'ইয়ারস ইন ক্যাপটিভিটি' (প্ল্যাস্টার)
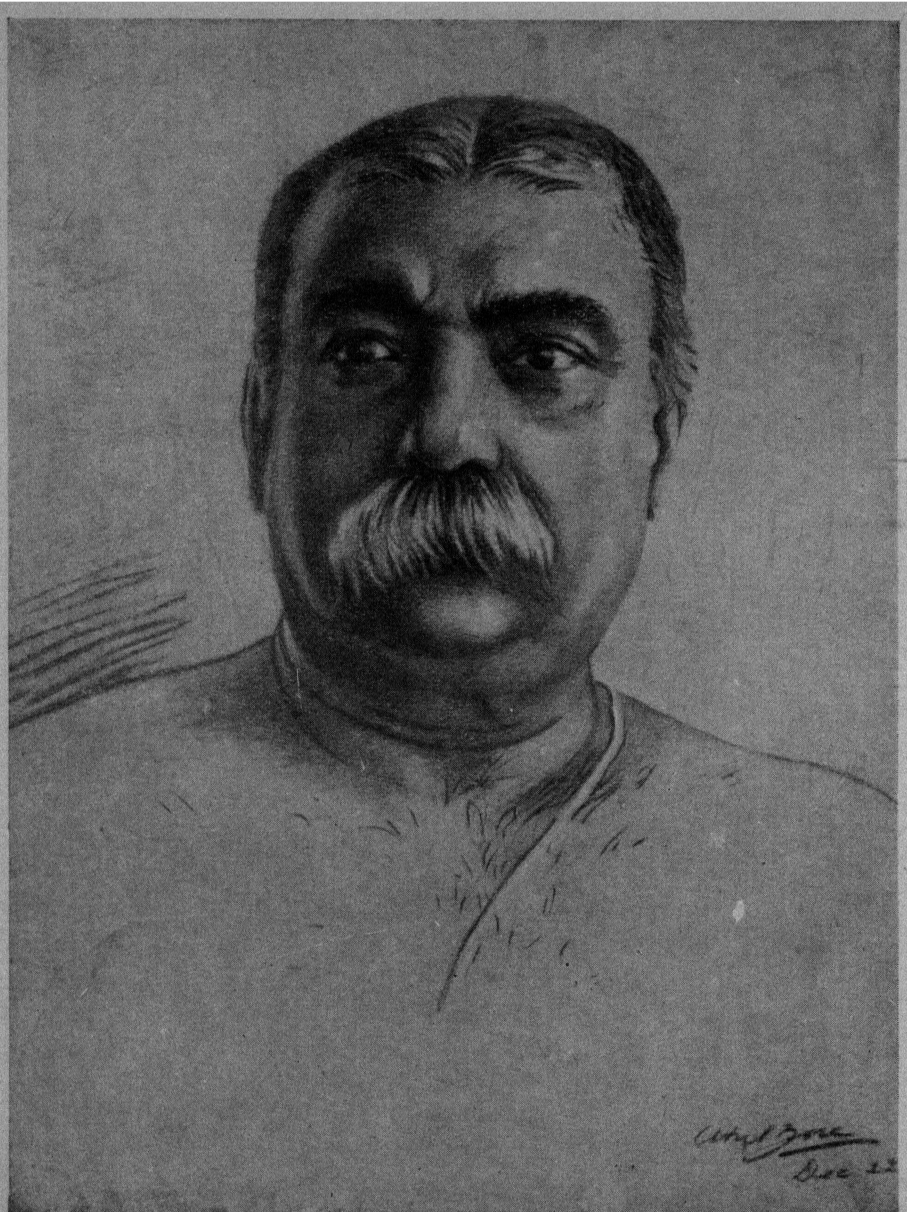
অতুল বসু অঙ্কিত 'বেঙ্গল টাইগার' (চারকোল)

ভাস্কর্যের প্রধান মাধ্যম প্ল্যাস্টার এবং প্ল্যাস্টারের মাধ্যমেই রচনা করেন নানা প্রতিকৃতি ও মনঃকল্পিত ভাস্কর্য। তাঁর প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যের উল্লেখ্য নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ ও মনোরমা দেবী। রিলিফ ভাস্কর্যেও তাঁর প্রগাঢ় পারদর্শিতা ছিল। রিলিফের মাধ্যমে কৃষ্ণদাস পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি তাঁর নৈপুণ্যের মনোজ্ঞ স্বাক্ষর। রিলিফ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মনোজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর এক বৃহৎ রিলিফ প্রতিকৃতির প্রতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের এ প্রতিকৃতিটি তাঁর সামনে বসেই রচনা করেছিলেন প্রমথনাথ। সহপাঠী শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একাধিক চিত্রও তিনি ভাস্কর্যে রূপায়িত করেন।

আক্ষরিক অর্থে ভারতের প্রায় সব বিশিষ্ট প্রদর্শনীতেই তাঁর অংশ গ্রহণ এবং বহু পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র লাভ। কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট এবং সোসাইটি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর ভাস্কর্যকলার স্বীকৃতির যে সূচনা, তার পুনরাবৃত্তি বোম্বাই, সিমলা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে। তাঁর 'সোল অব দি সয়েল' মাদ্রাজ ফাইন আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয় (১৯২৯)। ঐ বছরেই বাঙ্গালোরের 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর প্রতিযোগিতায় তাঁর শৃঙ্খলিত নারীমূর্তি 'ইন বণ্ডেজ' (অপর নাম 'ইয়ারস ইন ক্যাপটিভিটি') নিয়ে আসে শ্রেষ্ঠ সম্মান। একই ভাবে পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটি, সিমলা ফাইন আর্ট সোসাইটি, বোম্বে আর্ট সোসাইটি এবং অন্ধ্র সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ান আর্ট (কোকোনদ) প্রদর্শনীতে তাঁর হিজ রিওয়ার্ড, এ পোজ, ডেথ ইন লাইফ, দি ম্যাসন, দি বোটম্যান এবং আরও কয়েকটি প্রতিকৃতি, স্টাডি ও রিলিফ অর্থ, পদক ও ফলকে সম্মানিত হয়। কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠার পর সেখানেও তাঁর ভাস্কর্য একাধিকবার পুরস্কৃত হয়।

৬

প্রমথনাথের ভাস্কর্যের গুণগ্রাহী ছিলেন পার্সি ব্রাউন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রমথনাথের একাধিক মূর্তি ও রিলিফ রচনা। সরকারী আর্ট স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পার্সি ব্রাউন তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেক্রেটারি ও কিউরেটার। এই সময় নতুন দিল্লির প্রয়োজনে রবার্ট ক্লাইভের এক মূর্তি রচনার প্রয়োজন হয়। দিল্লির নির্দেশ ছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহীত জন টুইডের যে শ্বেতপাথরের সাড়ে সাত ফুট ক্লাইভ রয়েছে তার মতই হতে হবে নতুন মূর্তি। পার্সি ব্রাউন অনেক ভেবে এ কাজের দায়িত্ব প্রমথনাথকেই

দিয়েছিলেন। জন টুইডের মূর্তি অনুসরণে রচিত প্রমথনাথের সাড়ে তিন ফুট প্ল্যাস্টারের রবার্ট ক্লাইভ চলে যায় দিল্লিতে (১৯৩০)।

ঐ বছরেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রথম আর্ট এক্সপার্ট তথা কিউরেটার এফ হ্যারিংটনের স্মৃতি রক্ষার জন্য উদ্যোগী হন পার্সি ব্রাউন। এবারেও, বিশেষত ক্লাইভের সাফল্যে, হ্যারিংটনের দায়িত্ব প্রমথনাথকেই দিলেন তিনি। হ্যারিংটনের মুখচ্ছবি রচিত হলো গোলাকৃতি ব্রোঞ্জ রিলিফের মাধ্যমে। রিলিফটি এখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেই আছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্যে এই সময়েই রচনা করেছিলেন তিনি আরও দুটি-একটি ভাস্কর্য। তার মধ্যে পাওয়া যাবে পার্সি ব্রাউনের পত্নী মুরিয়েল ব্রাউনের মুখাকৃতিও। গোলাকার এই প্ল্যাস্টার রিলিফটিও প্রমথনাথের প্রতিকৃতি ভাস্কর্যকলার এক অনিন্দ্য দৃষ্টান্ত।

৭

উদ্ভাবনী শক্তির প্রভূত পরিচয় দিয়েও ভাস্কর্যকলার জগৎ থেকে তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান। স্বভাবতই সমকালীন ললিতকলার আলোচনায় তিনি এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব। পিতার যে অপত্যস্নেহ একদিন তাঁর বোম্বাই যাত্রার প্রতিবন্ধক হয়েছিল, সেই স্নেহেরই বশীভূত প্রমথনাথ নীরবে একদিন ভাস্কর্যকলার জগৎ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এক অশুভ মুহূর্তে তাঁর একমাত্র বিবাহিত কন্যার আকস্মিক পরলোকগমন। প্রমথনাথের কন্যা তাঁর একমাত্র নবজাত কন্যাসন্তানকে রেখে পরলোকগমন করেন। কর্তব্যের নির্দেশে সেদিন থেকে প্ল্যাস্টার ব্রোঞ্জের মূর্তির পরিবর্তে রক্তমাংসের এক শিশুর রূপকারের ব্রতই তিনি গ্রহণ করেন। নবজাত দৌহিত্রীর দায়িত্বে সেদিন থেকেই তাঁর ভাস্কর্য ত্যাগ।

একঘর সাজানো ছোট বড় নানা ভাস্কর্যের মধ্যে বসে অতীতের স্মৃতিচারণ করছিলেন প্রবীণ ভাস্কর। অশীতিপর প্রমথনাথের কথায় কিন্তু কোনো ক্ষোভ নেই — নেই কোনো নালিশ। অনুচ্চকণ্ঠে নিজের পরলোকগত কন্যার নানা বয়সের মলিন মূর্তিগুলির দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে বললেন—"ওই ছিল আমার অনুপ্রেরণা। দেখুন কত মূর্তি গড়েছি ওর নানা বয়সের। ওর পরলোকগমনের পর তাই আর উৎসাহ পাইনি। প্ল্যাস্টার ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়া শিখেছিলাম কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ গড়া জানতাম না। বিধাতার নির্দেশে তাও শিখেছি। বড় বড় ভাস্করেরা এখানে হেরে যেতে পারেন। আমি কিন্তু হারিনি। এই দেখুন আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, আমার সেই দৌহিত্রীকে।"

অতুল বসু

স্বনামধন্য শিল্পী

রবীন্দ্রনাথের জামাতা, মাধুরীলতা দেবীর স্বামী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বুদ্ধি দিয়েছিলেন উদীয়মান অতুল বসুকে। শুভানুধ্যায়ী শরৎচন্দ্রের পরামর্শ শুনে প্রথমে পিছিয়ে এসেছিলেন তরুণ শিল্পী। কারণ, যে বাঘের দশ হাতের মধ্যে কেউ যেতে সাহস করে না, তাঁকে গিয়ে কিছুতেই বলতে পারবেন না যে আপনার ছবি আঁকব, অসম্ভব। তবুও বারবার শোনার পর শরৎচন্দ্রের কথাই মেনে নিতে হয়েছিল তাঁকে। অতএব মনের সঙ্গে তুমুল তর্ক করে দুরুদুরু বুকে অতুল বসু পা বাড়ালেন ভবানীপুরের দিকে।

ডিসেম্বর মাসের সকাল। রসা রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় সপারিষদ বসে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। ইজেল বগলে অতুলকে দেখে স্বভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—কী চাই? নিরুত্তর অতুল আশুতোষের কথার জবাব না দিয়ে সোজা তাঁর সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—আমি অতুল, আপনার ছবি আঁকতে এসেছি।

অদ্ভুত কথা, স্যার আশুতোষ কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। অতুলের কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকেন তিনি। আশুতোষের নিস্তব্ধতায় অতুলের হৃদস্পন্দন যেন আরও বেড়ে যায়। বেড়ে যায় লজ্জা আর সঙ্কোচ। অনুমতি দেবেন না বোধহয়। ফিরে যাই, ছবি আঁকায় কাজ নেই—ভাবতে থাকেন অতুল। এমন সময় আশুতোষ বলে উঠলেন, আমার ছবি আঁকতে হলে গতকাল তোমার সিনেটে যাওয়া উচিত ছিল। এখন আমার সময় নেই। স্নান সেরে বেরুতে হবে।

আশুতোষের কথায় বিফলমনোরথ অতুল যখন ভাবছেন ফিরে যাই, ঠিক তখনই তিনি আবার বললেন—তেল মাখার সময় আমার ছবি আঁকতে পারবে? যদি পার তবে এস। আমি তেল মাখবো, তুমি ছবি আঁকবে।

আশুতোষের কথায় অতুল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাতেই রাজী। কয়েক মিনিটের মধ্যে সত্যি সত্যিই স্যার আশুতোষ এসে বসে গেলেন জলচৌকিতে তেল মাখতে। এই অবসরে অতুলও বসে গিয়েছেন ইজেল নিয়ে। অনন্যদৃষ্টি অতুলের চোখ তখন স্থিরনিবদ্ধ স্যার আশুতোষের মুখে। তিলমাত্র সময় যেন নষ্ট না হয়, দেরি হলেই উঠে চলে যাবেন।—হাতের আঁচড় টানতে টানতে নিজেকে সাবধান করতে থাকেন শিল্পী। জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন সে আজ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে দৃঢ়সংকল্প অতুলের হাতের চারকোলের আঁচড়ে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে উপবীতধারী এক তেজস্বী ব্রাহ্মণের চেহারা।

ওদিক তেল মাখাও শেষ হয়ে এসেছে স্যার আশুতোষের। কৌতূহল

দমন করতে না পেরে তিনিও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন অতুলের ছবির সামনে। খানিকক্ষণ ছবির দিকে চেয়ে থেকে সশব্দে বসিয়ে দিলেন এক চাপড় অতুলের পিঠে। আর সেই চাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র কথা—'শাবাশ'!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি ডিপ্লোমা নয়—নয় কোনো মানপত্র। 'বেঙ্গল টাইগার' হাতে নিয়ে যেদিন চব্বিশ বছরের অতুল বসুর যাত্রা শুরু সেদিন মাথায় ছিল তাঁর সাক্ষাৎ সরস্বতী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ। এ ঘটনা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের।

জীবনের সূচনাতেই কেবল নয়, প্রখ্যাতনামা হবার পরেও আর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। আশুতোষের ছবি আঁকার চৌদ্দ বছর পরে দ্বিতীয় পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাঁকে বোলপুরে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকতে তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। হাতের কাছে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চেপে ধরলেন তাঁকে—নন্দলালের একটা ছবি আঁকতে হবে তোমাকে। আগে দেখি তুমি কেমন পটো।

অতুল কিন্তু নন্দলালের ছবি আঁকতে বোলপুরে যাননি। তাই কবির কথায় তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন। অতুলের দ্বিধা দেখে রবীন্দ্রনাথ আরও চেপে ধরলেন। বললেন—তুমি কিছুতেই বোলপুর ছাড়তে পারবে না, নন্দলালের একখানা ছবি আঁকতেই হবে তোমাকে। কথোপকথনের সময় নন্দলালও ছিলেন সেখানে। কবির কথায় সায় দিয়ে হাসতে হাসতে নন্দলাল বলে উঠলেন—অসুবিধা কী? আইভরি ব্ল্যাক লাগিয়ে দাও; আমার ছবি হয়ে যাবে।

রয়্যাল অ্যাকাডেমির ছাত্র অতুল যেন ফেটে পড়লেন নন্দলালের কথায়। পলকের মধ্যে আইভরি ব্ল্যাকের টিউবটা ঝোলা থেকে বের করে ছুঁড়ে দিলেন কবির পায়ের কাছে। অতুলের ভাবটা যেন, আইভরি ব্ল্যাক জমা রইল গুরুদেবের কাছে। আইভরি ব্ল্যাক ছাড়াই আপনার ছবি আঁকব নন্দবাবু। তারপর বসলেন আঁকতে। তুলে নিলেন আলট্রা মেরিন আর আম্বার। সঙ্গে আরও দুটি একটি রঙ। ঘণ্টাখানেক। নন্দলালের ছবি শেষ হলো। কবি আর নন্দলালের মুখে তখন বিস্ময়ের হাসি।

আইভরি ব্ল্যাক ছাড়াও যে কালো মানুষের গায়ের রঙ আঁকা যায় সেদিন আম্বার আর আলট্রা মেরিন দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন অতুল বসু। নন্দলাল বসুর সে তৈলচিত্র এখনও আছে।

২

বিগত ষাট বছরের চারুকলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার সৌভাগ্যে যে কয়েকজন শিল্পী সৌভাগ্যবান তাঁদের অন্যতম অতুল বসু। প্রধানত প্রতিকৃতি শিল্পীরূপেই তিনি যশস্বী এবং নিঃসন্দেহে প্রতিকৃতি চিত্রকলার তিনি এক দিকপাল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তেলরঙের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক প্রথায় প্রতিকৃতি চিত্র রচনায় বাঙ্গালী শিল্পীদের যে ঐতিহ্য তার সুযোগ্য উত্তরসাধক তিনি। তাঁর পূর্বগামী যে শিল্পীরা চিত্রবিদ্যার এই শাখাকে সাফল্যের স্তরে উন্নীত করে কলারসিক মহলে পৌঁছে দেন তাঁদের অগ্রদূত গঙ্গাধর দে। গঙ্গাধরের সমকালেই প্রমথনাথ মিত্র প্রতিকৃতি শিল্পীরূপে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁদেরই যুগে চারুকলার এ শাখাকে সমৃদ্ধ করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। উনিশ শতকের আদর্শস্থানীয় চিত্রকর অন্নদাপ্রসাদের পরলোকগমনের জন্যে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা তাঁর সমবয়সী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈপুণ্যে দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। অন্নদাপ্রসাদ-বামাপদর জীবনকালেই প্রতিকৃতি চিত্রে অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেন শশিকুমার হেশ। শশিকুমারের রঙ ব্যবহারের কৌশল সে যুগে অননুকরণীয় প্রযুক্তি হিসেবেই পরিগণিত হতো। বামাপদ-শশিকুমারের যুগে এই চিত্রকলার অপর খ্যাতনামা শিল্পী জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কবি ও শিল্পী জলধিচন্দ্র এ যুগে বিস্মৃত। জলধিচন্দ্রের সময়েই প্রতিকৃতি চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে আত্মোৎসর্গ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশনাথ সেন ও পুলিন কুণ্ডু। যামিনীপ্রকাশের ঐন্দ্রয়িক অক্ষমতা তাঁর প্রতিভাশালী মনশ্চক্ষুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁর সময়েই ভবানীচরণ লাহা, সুরেন্দ্রনাথ দাস, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ প্রতিকৃতি চিত্রকলায় প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

পরবর্তী সময়ে চারুকলার এ শাখায় গৌরবের অধিকারী যামিনী রায়, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সিংহ ও ললিতমোহন সেন। যামিনী রায়, হেমেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র ও ললিতমোহনের যুগ থেকে যে-শিল্পী এই একই ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় লালন-পালন করেছেন তিনি অতুল বসু।

৩

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা শিক্ষাব্রতী শশিকুমার বসুর পৈতৃক বসবাস ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের রসুনিয়া গ্রামে।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর ময়মনসিংহ শাখা থেকে অতুল প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। অতঃপর এঞ্জিনীয়ারিং পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতার 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এ তাঁর প্রবেশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের আদি পর্যায় বেঙ্গল টেকনিক্যালে তাঁর অধ্যয়নকাল মাত্র এক বছর। এই শিক্ষায়তনের ছাত্র থাকাকালেই তিনি চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অভিভাবকদের অসম্মতি সত্ত্বেও 'জুবিলি আর্ট

অ্যাকাডেমি'-তে ভর্তি হন। রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তের 'জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি' কলকাতার চতুর্থ চারুকলা বিদ্যালয়। বিত্তশালী নাগরিক আর কলকাতা পুরসভার অর্থসাহায্যে রণদাপ্রসাদ এই চারুকলা বিদ্যালয়কে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ও যোগেশচন্দ্র শীল এবং ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিক 'জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি'-তে অতুল বসুর সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পার্শি ব্রাউনের অধ্যক্ষতাকালে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। স্বনামধন্য শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় তখন সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল। যামিনীপ্রকাশের তত্ত্বাবধানে 'ফাইন আর্ট' বিভাগে তাঁর চিত্রবিদ্যা অনুশীলন এবং শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন (১৯১৮)।

অতুল বসুর সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ ত্রিশের দশকে শুরু হলেও বিশের দশকেই চিত্রকলার এ শাখায় তাঁর সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান। প্রতিকৃতি চিত্র রচনার জন্যে তাঁর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সূচনা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি রচনার মাধ্যমে নিজের পারদর্শিতার যে দৃষ্টান্ত তিনি *সেদিন উপস্থিত করেছিলেন* তা পরবর্তী সময়ে প্রমাণ করেছে যে, জীবনের শুরুতে *তিনি সঠিক পথেরই সন্ধান পেয়েছিলেন*।

ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর একাধিক চারুকলা সংস্থা সংগঠনের মাধ্যমে তাঁর যে ভূমিকা তা আলোচনার যোগ্য। কারণ, তাঁর সংগঠক ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তই নয়, বাঙ্গলার বিগত-কালের চারুকলা আন্দোলনের এক অধ্যায়ের ইতিহাসও সহজলভ্য।

তাঁর ছাত্রজীবন সমাপ্তির সময়ে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উল্লেখযোগ্য চারুকলা সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার ধারক ও বাহক রূপেই পরিচিত এ প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে অ্যাকাডেমিক ভাবাদর্শের বাস্তবধর্মী শিল্পীরা তখন বিচ্ছিন্ন। সে কারণে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে বাস্তব-ধর্মী শিল্পীদের একত্র হওয়ার যে উদ্যোগ সেখানে যামিনী রায়, হেমেন্দ্রনাথ, আর্যকুমার চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র শীল, অনাদি সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজনের সঙ্গে অতুল বসুও সক্রিয় ছিলেন। সংস্থাটির নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট'। সংস্থার নামেই এক ইংরেজি ত্রৈমাসিকও এই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। অতুল বসু এ চারুকলা সংস্থার তৃতীয় সম্পাদক।

বিডন স্ট্রীটের সংস্থাটি বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাস্তবধর্মী শিল্পীদের যে নতুন আর এক চারুকলা সংস্থার জন্ম তার নাম 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস'। ভবানীচরণ লাহা এ সংস্থার প্রথম সম্পাদক। তাঁর সহকারী সম্পাদকরূপে এ সংস্থার প্রথম সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন অতুল বসু। 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক

প্রদর্শনীতেই অতুল বসুর আঁকা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি 'বেঙ্গল টাইগার' চিত্রের আত্মপ্রকাশ (১৯২২)।

৪

চারুকলা চর্চা আর চারুকলা সংস্থা সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কোণে ছিল এক উচ্চাভিলাষ। পোর্ট্রেট যদি আঁকতেই হয় তবে যেতে হবে ইউরোপে। অ্যাকাডেমিক রীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের একান্ত অভাব। তাই ইচ্ছে থাকলেও উদ্যোগী হননি প্রকাশ্যে। স্যার আশুতোষের চিত্রের সাফল্যের পটভূমিতে নতুন করে ভাবতে বসলেন শিল্পী এবং অচিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন এক আবেদন।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ চাই। চারুকলা শিখতে ইউরোপ যাবার জন্যে শিল্পীদের এ স্কলারশিপ দেবার নজীর আছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে দেওয়া হয়েছিল গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পূর্ণচন্দ্র ইউরোপ যেতে পারেননি।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে স্যার আশুতোষ ফিরিয়ে দিলেন অতুলের দরখাস্ত। আমার ছবি এঁকেছো বলেই যে তুমি স্কলারশিপ পাবে তা হবে না। তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসংশয়। তবুও প্রমাণপত্র আনতে হবে তোমাকে। এদেশের চারুকলা জগতের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এনে দেখাও তোমার যোগ্যতার প্রশংসাপত্র।

দৃঢ়সংকল্প অতুল কয়েকদিনের মধ্যেই জমা দিয়েছিলেন দুটি সার্টিফিকেট। প্রথমটি প্রিন্সিপাল পার্শি ব্রাউনের, দ্বিতীয়টির লেখক অনারেবল স্যার আবদার রহিম। বাঙ্গলার গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। অনুমোদত হয়েছিল অতুলের আবেদন।—খৃষ্টাব্দ ১৯২৩। ইউরোপ যাত্রা আরও কিছু পরে—১৯২৪।

ইংল্যাণ্ডের ললিতকলা অনুশীলনের বারাণসী রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব আর্টস সেদিন তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল। ইংরেজ রাজত্বের ছাড়পত্র নিয়ে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির স্কুল অব পেন্টিং-এ তাঁর যোগদান। সেখানে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ওয়ালটার রিচার্ড সিকার্ট, স্যার চার্লস সিমস, মেলটন ফিশার এবং গ্লিন ফিলপটকে। জীবন্ত মানুষের দেহের চিত্ররচনার সঙ্গে শিক্ষকদের নির্দেশে ন্যাশনাল গ্যালারিতে গিয়ে অনুলিপি করেছেন ধ্রুপদী চিত্রকলার প্রাতঃস্মরণীয়দের চিত্র। বসে বসে স্কেচ করেছেন শিক্ষাদানরত সিকার্টকে। ছবি দেখা ও আঁকার প্রয়োজনে গিয়েছেন ফ্লোরেন্স, প্যারিস আর ব্রাসেলসে। দু'বছর অনুশীলনের পর যখন তাঁর প্রত্যাবর্তন তখন তাঁর হাতে রয়্যাল অ্যাকাডেমির 'আইভরি' আর সার্টিফিকেট।

ইউরোপ থেকে ফিরে শিক্ষকতা পেয়েছিলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা হয়নি। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো আর ছবি আঁকা যখন

চলছিল তখন রটে গেল এক অভিনব প্রতিযোগিতার খবর। নতুন দিল্লিতে সরকারী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে চিত্রকলার এক প্রতিযোগিতা।

লর্ড আরউইন তখন বড়লাট। সরকারী সদিচ্ছা হিসেবে ঠিক হয়েছে যে দুজন ভারতীয় শিল্পীকে দিয়ে বাকিংহ্যাম প্যালেস আর উইণ্ডসর ক্যাসলে রাখা ইংল্যাণ্ডের দুই রাজা ও রানীর ছবি অনুলিপি করিয়ে নতুন দিল্লির বড়লাটের বাড়িতে আনা হবে। এ-কাজের জন্যে শিল্পী নির্বাচন করা হবে এক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। জীবন্ত মানুষ দেখে নয়, দুজন যশস্বী ইংরেজ শিল্পীর আঁকা রাজা-রানীর তৈলচিত্র দেখে যথাযথ অনুলিপি করতে হবে উত্তীর্ণ প্রতিযোগীদের। ভারতীয় শিল্পীমহলে সেদিন প্রভূত আলোড়ন তুলেছিল এ সংবাদ।

বহু কৃতী শিল্পীর সঙ্গে অতুলও সেদিন এগিয়ে গিয়েছিলেন এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। অনুলিপির যোগ্যতাই যখন এ প্রতিযোগিতার মূল শর্ত তখন তিনি ঠিক করলেন প্রাক্তন বড়লাট লর্ড লিটনের চিত্রই অনুলিপি করবেন। অতএব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুডের শিল্পী স্যার জন মিলায়েসের অনুসরণে আঁকা ডোবোফিল্ড হার্ডির লর্ড লিটনকে অনুলিপি করে নিয়ে গেলেন দিল্লিতে।

বলা বাহুল্য, সর্বভারতীয় এ প্রতিযোগিতায় ভারত সরকার যাঁর নাম প্রথম ঘোষণা করেন তিনি অতুল বসু। অতুলের সঙ্গে বোম্বাইয়ের শিল্পী জেহাঙ্গীর আর্দেশীর লালকাকাও নির্বাচিত হয়েছিলেন এ-কাজের জন্যে। খৃষ্টাব্দ ১৯৩০।

বাকিংহ্যাম প্যালেস আর উইণ্ডসর ক্যাসলে রাখা রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড আর কুইন মেরীর তৈলচিত্র অনুলিপির ভার পড়েছিল অতুলের ওপর। কুইন আলেকজান্দ্রা আর পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতির দায়িত্ব পান লালকাকা।

অতুলের অনুলিপি-করা সপ্তম এডোয়ার্ডের চিত্রটির শিল্পী রয়্যাল অ্যাকাডেমিশিয়ান লুক ফাইল্ডস। তিনি তখন পরলোকে। কিন্তু কুইন মেরির তৈলচিত্রের শিল্পী উইলিয়াম লুইলিন তখনও জীবিত। রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ পি আর এ লুইলিনের কাছে খবর গেল অতুলের অনুলিপি শেষ হয়েছে। আপনি একবার আসুন—এসে অভিমত দিয়ে যান, কেমন হলো অতুলের ছবি।

ভারতের হাইকমিশনার স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জির সঙ্গে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের ললিতকলার সর্বাধিক সম্মানিত মানুষ উইলিয়াম লুইলিন গিয়েছিলেন উইণ্ডসর ক্যাসলে। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের ডাইরেক্টার ক্যাপ্টেন উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন সলোমোন।

অতুলের অনুলিপি দেখে প্রথমেই লুইলিনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তিনটি মাত্র কথা—'ভেরি ওয়েল ইনডিড।' তারপর এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করেন তিনি অতুলের সঙ্গে। আমি তৃপ্ত, ঠিক হয়েছে কাজ। তারপর কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখে স্যার অতুলচন্দ্রের দিকে ফিরে তিনি বললেন—ভাইসরয়কে জানিয়ে দিতে
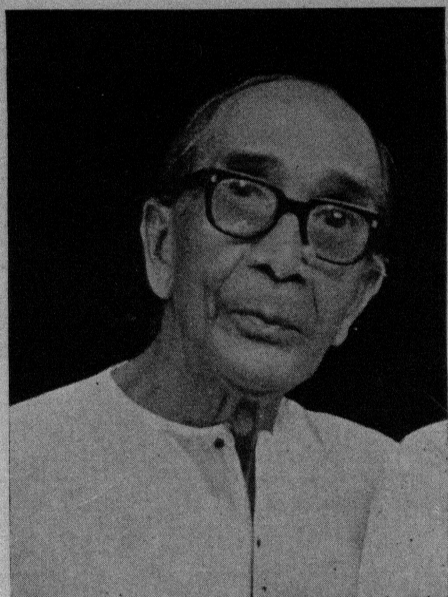
অতুল বসু
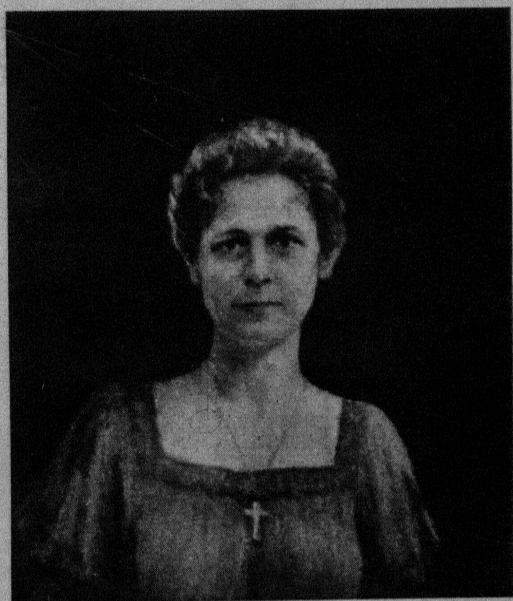
অতুল বসু অঙ্কিত মাইকেল-পত্নী
হেনরিয়েটা (তেল)
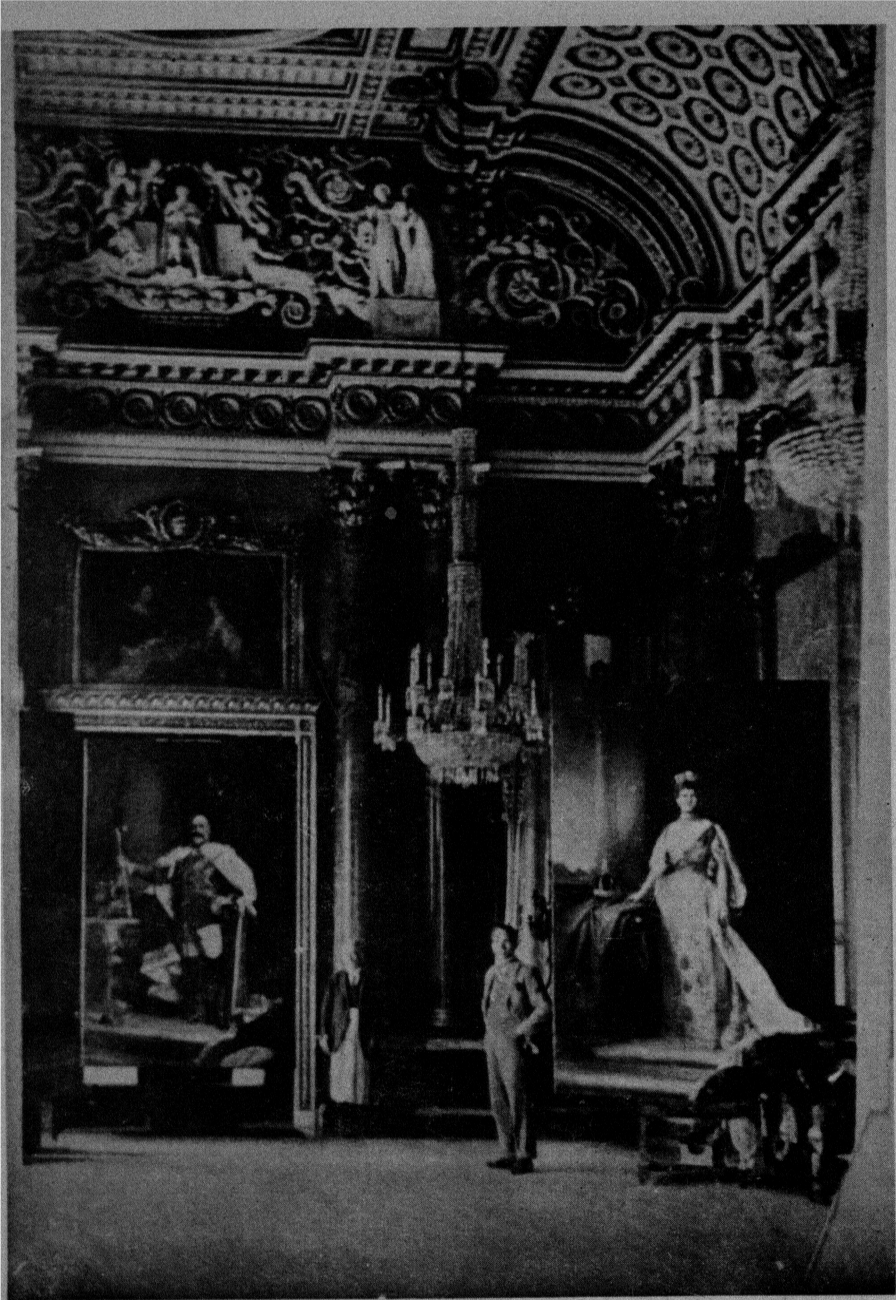
বাকিংহ্যাম প্যালেসের ব্লু ড্রইং রুমে নিজের অঙ্কিত সপ্তম এডোয়ার্ড ও কুইন মেরীর তৈলচিত্র সহ অতুল বসু (ডান দিকে)

পারেন যে এ ছবির দিল্লি যাবার যোগ্যতা আছে। আমার অভিমত চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো।

সাফল্যের খবর নতুন দিল্লিতে পৌঁছুনোর পর নতুন করে আবার লণ্ডনে খবর গেল—আরও দুজোড়া ঐ একই ছবি অনুলিপি করতে হবে। এবারে ভাইসরয় নন, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের বাড়ির জন্যে চাই ঐ একই পোর্ট্রেট। দ্বিতীয় নির্দেশও পালিত হয়েছিল যথাযথভাবে।

ইতিমধ্যে অতুলের ক্ষমতার খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল লণ্ডনের অভিজাত মহলে। বিশ্ববিশ্রুত স্থপতি স্যার এডুইন ল্যাটিয়েন্স তখনও বেঁচে। তিনিও অতুলের মত রয়্যাল অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছ থেকে এল এক অনুরোধ। নতুন দিল্লির নগর পরিকল্পনার উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের পরিকল্পনাকারী স্যার এডুইনও অতুলদের ছবি দেখতে উইণ্ডসর ক্যাসলে গিয়েছিলেন। অতুলের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন—ছবি অনুলিপি করে তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত! আঁক না আমার লাইফ থেকে একটা ছবি—খুব খুশি হব।

লর্ড লিটনের জামাতা স্যার এডুইন ল্যাটিয়েন্সের অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারেননি অতুল। অনেক অসুবিধার মধ্যেও এ'কেছিলেন তাঁর এক পোর্ট্রেট। ইংল্যাণ্ডে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার ওপর স্যার এডুইন থাকেন লণ্ডনে। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে প্রতিদিন ভোর ছটার এক্সপ্রেস বাস ধরে উইণ্ডসর থেকে একুশ মাইল দূরে লণ্ডনে গিয়ে স্যার এডুইনকে সামনে বসিয়ে এ'কে দিয়েছিলেন তাঁর এক মনোজ্ঞ পোর্ট্রেট।

এ কাজ শেষ হতে না হতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক চিঠি পেলেন অতুল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে লেখা সে চিঠিতে ছিল এক অভিনব প্রস্তাব। প্রেসিডেন্সির স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যারিংটন পার্শিভ্যালের একটি তৈলচিত্র চাই। কলকাতায় পার্শিভ্যালের কোন ছবি নেই। চিঠি দেওয়া হয়েছিল পার্শিভ্যালকেও, তিনিও রাজি হয়েছেন শিল্পীর সামনে বসতে।

অতুল তখন লণ্ডনে। ঠিক করলেন এক বন্ধুর স্টুডিওতে বসে আঁকবেন পার্শিভ্যালকে। অতএব নটিংহিলে গিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন অধ্যাপকের বাড়িতে। অতুলের সুবিধের জন্যে পর পর কয়েকদিন এসে বৃদ্ধ পার্শিভ্যাল সিটিং দিয়েছিলেন অতুলের সেই বন্ধুর স্টুডিওতে।

ইংরেজ রাজত্বের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দিনগুলিতে বড়লাটের বাড়িতে অতুল বসু সেদিন এক নাম। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পরে শিল্পী জানতে পারলেন সেকথা আরও ভালভাবে। ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন আগের বড়লাট, এসেছেন আর্ল অব উইলিংডন। শিল্পীর ডাক পড়ল ভাইসরিগ্যাল হাউসে। এবারেও অনুলিপি করতে হবে লর্ড আর লেডি উইলিংডনের তৈলচিত্র। অসওয়াল্ড বার্লি আর ল্যাজলোর আঁকা লর্ড ও লেডি উইলিংডনের তৈলচিত্র অনুলিপি করে দিলেন তিনি দিল্লিতে বসেই।

দিল্লির চীফ কমিশনার তখন স্যার জন টমসন। অতুলের কাজ দেখে তিনি

বিস্মিত। অতএব টমসনও এসে বসলেন তাঁর সামনে। এঁকে দিন আমারও এক তৈলচিত্র। দুর্বার গতি অতুলের তুলিতে ধরা পড়ে গেলেন দিল্লির চীফ কমিশনার। মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি।

৫

সৃষ্টির সঙ্গে কীর্তির বড় নিকট আত্মীয়তা। এ দুনিয়ার তাবৎ কীর্তির মূলে সৃষ্টি একথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন অতুল। কিন্তু সৃষ্টির গোড়ার কথা যে কর্মশক্তি। তাই সৃজনীশক্তির সঞ্জীবনী সুধায় অবগাহন করে যেদিন তাঁর পথ চলার শুরু সেদিন থেকেই পাওনা তাঁর পথের দুপাশে দাঁড়ানো গুণগ্রাহীদের আশীর্বাদ। সে গুণগ্রাহীদের কেউ কেউ ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ; আবার কেউ সহাস্যে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। ছাত্রবয়স থেকে তেলরঙে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি রচনার যে সূচনা তাঁর প্রথম মানুষ ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। তারপর একে একে এঁকেছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি প্রিয়ংবদা দেবী, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরী প্রমুখকে।

অতুল বসুর খ্যাতি যখন মধ্যগগনে তখন অনুপ্রেরণার তাগিদে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। বিশ্বকবির ছবি যদি না আঁকি তবে জীবনটাই বৃথা। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোর্ট্রেট আঁকার পরেই তাঁর বোলপুর যাত্রা। নন্দলালের ছবি আঁকার পরীক্ষা দিয়ে তাঁকে আঁকতে হয়েছিল কবিকে। আটদিন সময় নিয়েছিলেন শিল্পী কবির এই লাইফ-সাইজ ছবি শেষ করতে। রক্তিমবর্ণের আত্মমগ্ন নিজের ছবি দেখে বিস্মিত কবি প্রশ্ন করেছিলেন অতুলকে—"আমি চমকে উঠলুম, এই শোকার্ত একলা আমি ; তুমি আমাকে পেলে কী করে ?"

সাত রাজার ধন এক মানিকের মত অতুল বহুদিন আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন কবির সে তৈলচিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। স্বাধীনতার পরে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী অনুনয় করে চেয়ে নিয়েছিলেন সে ছবি। অতএব অতুল বসুর কবিকে-পাওয়া সে ছবি চলে যায় রাজভবনে। গভর্নর রাজাগোপালাচারীর ইচ্ছে ছিল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টাঙানো হবে কবির ছবি রাজভবনে। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। কারণ, কিছুদিন পরেই রাজাগোপালাচারী গভর্নর-জেনারেল হয়ে চলে যান দিল্লি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে অতুল বসুর জানতে ইচ্ছে হয় কবির ছবি কেমন আছে রাজভবনে। তাই তিনি যোগাযোগ করেছিলেন রাজভবনের সঙ্গে। কিন্তু ছবিটির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই। রাজাগোপালাচারীর পরে একে একে এসেছেন ও গিয়েছেন অনেক রাজ্যপাল। কৈলাসনাথ কাটজু, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পদ্মজা নাইডু, ধর্মবীর এবং ধাওয়ান। অবশেষে রাজ্যপাল এ এল ডায়াস আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথের ছবিটিকে রাজভবনেরই এক ঘরে। কিন্তু ছবিটি তখন ভীষণভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব রাজ্যপাল ডায়াসের নির্দেশে সংস্কারসাধনের জন্যে ছবিটিকে পাঠানো হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। ছবিটির ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়ালে পৌঁছুনোর খবর হঠাৎ পেয়ে যান এ গ্রন্থের লেখক এবং তিনিই সেকথা জানিয়ে দেন শিল্পীকে। খবর নিয়ে অতুল বসু অবাক। সত্যিই ছবিটি রাজভবন থেকে গিয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

সেই খবর পেয়ে অতুল বসু যোগাযোগ করেছিলেন নিশীথরঞ্জন রায়ের সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেক্রেটারি নিশীথরঞ্জন রায়ের অনুরোধে অতুল বসুর রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ডায়াস। কারণ, অতুল বসুর ইচ্ছে এ ছবির পুনরুদ্ধার তিনি নিজেই করবেন। করেওছিলেন তা তিনি। নিজের হাতে সংস্কার করার পর অতুল বসুর রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে যায় রাজভবনে। এ ঘটনা ১৯৭৬-এর এপ্রিল মাসের।

শান্তিনিকেতনে বসে কবির ছবি আঁকার খবর পৌঁছেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও। তৎকালীন সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাদের তাই লোভ ছিল কবির ঐ ছবির প্রতি। রাজাগোপালাচারীর সময়ে রাজভবনে চলে যাবার পর তাঁরা এসে বলে-ছিলেন ঐ রবীন্দ্রনাথই চাই। অনন্যোপায় শিল্পী নিজের আঁকা ছবির অনুসরণে এঁকে দিয়েছিলেন দ্বিতীয় এক বিশ্বকবিকে। সাহিত্য পরিষদে আছে সেই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ।

৬

সমকালীন যুগের অদ্বিতীয় প্রতিকৃতি শিল্পী অতুল বসুর সৃজনীশক্তির অনন্য-সাধারণ দৃষ্টান্ত অ্যানা ওরনসোলট-এর প্রতিকৃতি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একান্ত সচিব এবং পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরুর 'হাউসকীপার' এই ডেনিস বিদুষী অ্যানার প্রতিকৃতি তাঁর চিত্রকলার এক মনোজ্ঞ নিদর্শন। এ পর্যায়ের তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে যাঁদের চিত্র রীতিবৈচিত্র্যের কলাকৌশলে উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি বিচারপতি স্যার এডুইন এজলি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কামিনীকুমার দত্ত, স্যার বি এল মিত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, কবি সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত ও সাংবাদিক লিণ্ডসে এমারসন উল্লেখযোগ্য। রীতিবৈচিত্র্যের সঙ্গে বর্ণ-বিন্যাসের বিস্ময়কর প্রয়োগকর্মে রচিত তাঁর চিত্রের তালিকায় আছেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, লালা শ্রীরাম, যতীন্দ্রনাথ বসু, দেবপ্রসাদ গর্গ ও সজনীকান্ত দাস।

তাঁর সমকালীন কয়েকজন শিল্পীরও প্রতিকৃতি এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর এ অধ্যায়ের স্মরণীয় চিত্র 'লালকাকা অ্যাট ওয়ার্ক ইন বাকিংহ্যাম প্যালেস'। দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও অগ্রজপ্রতিম শিল্পী যামিনী রায় ও স্নেহাস্পদ গোবর্ধন আশও আছেন এ তালিকায়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে যদি অতুল বসুর চারুকলাচর্চার আদ্যোপান্ত সমীক্ষা করা হয় তবে দেখা যাবে যে শুধু প্রতিকৃতি চিত্র নিয়েই সীমাবদ্ধ নয় তাঁর জীবন। সেখানে আছে তাজমহল ও কাঞ্চনজঙ্ঘার নানা চিত্র। আছে বহু দেশী-বিদেশী দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে দিল্লির বিমান বন্দর, ইলোরা, কৈলাস এবং পদ্মার বুকে সূর্যাস্তের ছবি।

আটাত্তর বছর বয়সের শিল্পীর চিত্রের তালিকায় অজস্র নাম, অসংখ্য বিষয়। সেই সংখ্যাহীন রচনার এক উল্লেখ্য নাম 'কমরেডস'। গুণটানা দুই হিন্দু ও মুসলমান মাঝির ছবি 'কমরেডস' বিশের দশকের এক সম্মানিত রচনা।

৭

প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি এবং মনঃকল্পিত চিত্ররচনার সঙ্গে আরও এক বিশেষ ধরনের প্রতিকৃতি রচনার জন্যেও তিনি পরিচিত। তাঁর এ চিত্রগুলিকে পরোক্ষ প্রতিকৃতি বলাই শ্রেয়ঃ। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং সরকারী ভবনে যখন জাতীয় মনীষী ও নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই পরোক্ষ প্রতিকৃতি রচনায় তাঁর আত্মনিয়োগ।

তাঁর পরোক্ষ প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে পার্লামেন্টের কথা। পূর্বগামীদের আঁকা ছবি আর ফোটোগ্রাফের সহায়তায় অঙ্কিত তাঁর এ পর্যায়ের রাজা রামমোহন রায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চারটি বৃহৎ চিত্ররচনা লোকসভার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনেও আছে তাঁর এ পর্যায়ের আরো চারটি চিত্র—রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু শিল্পীর সর্বাধিক পরোক্ষ প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। পার্শি ব্রাউনের উৎসাহে 'কণ্টস'-এ আঁকা রবীন্দ্রনাথের এক প্রতিকৃতি দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তাঁর চিত্র সংগ্রহের সূচনা। স্বাধীনতার পরে তাঁর প্রথম তৈলচিত্র ডাবলিউ সি বোনারজি ভিক্টোরিয়ায় স্থাপিত হয়। অতঃপর রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের তৈলচিত্র ভিক্টোরিয়ার ন্যাশনাল লিডারস পোর্ট্রেট গ্যালারিতে স্থাপন করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের তৈলচিত্রটি নেভিল চার্লস ড্যাটনের অনুরোধে এঁকেছিলেন অতুল বসু। সেকথা পঞ্চাশের দশকের। অতুল বসুর আকর্ষণে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া মানুষের মধ্যে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৌত্র নেভিল চার্লস ড্যাটন। পিতামহ মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষায় তৎপর হয়ে তাঁর এক তৈলচিত্র রচনার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি শিল্পীর কাছে। বৃহদাকার এ তৈলচিত্র রচনার জন্যে শুধু অর্থব্যয়ই নয়, উনিশ শতকের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং একাধিক ফোটোগ্রাফ দিয়েও তিনি সাহায্য করেছিলেন শিল্পীকে। সমাপ্তির পর নেভিল

তাঁর বাসস্থান পার্ক স্ট্রীটের 'জানকী ম্যানসান'-এ নিয়ে গিয়েছিলেন মাইকেলের এই তৈলচিত্রটি।

মাইকেলের চিত্র রচনার সময়ে অতুল বসুর হাতে আসে হেনরিয়েটার এক ফোটো-গ্রাফ। নেভিল তাঁর পারিবারিক সংগ্রহে হঠাৎ আবিষ্কার করেন তাঁর পিতামহীর এ ফোটোগ্রাফটি। জরাজীর্ণ এই ফোটোগ্রাফটি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নেভিল এটিও দিয়ে-ছিলেন অতুল বসুকে। এই ফোটোগ্রাফ অনুসরণে অতুল বসু রচনা করেন মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটার এক মনোজ্ঞ তৈলচিত্র (১৯৫৪)।

৮

সাভিনিবেশে চারুকলা চর্চার সঙ্গে চারুকলা আন্দোলনও করেছেন তিনি। ১৯১৯-এ ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট নিয়ে যার সূচনা তার পূর্ণ বিকাশ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের মধ্যে।

জহুরী যেমন সাচ্চা জহরৎ চেনে তেমনি তাঁকে চিনে নিয়েছিলেন মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর। তাই কলকাতায় যখন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠা তখন তাঁর ডাক পড়েছিল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। বহু বাধা, নানা বিপত্তি অতিক্রম করে যখন উদ্‌ঘাটিত হয় অ্যাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনী তখন অতুল বসুর প্রশংসায় সকলেই সোচ্চার। সে প্রশংসার কোলাহল এখনও শোনা যায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পত্র-পত্রিকায়।

সমকালীন চিত্রকলা আন্দোলনে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় অ্যাকাডেমির জন্ম। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এনেছিলেন স্যার ডেভিড এজরা। প্রথমে নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'। প্রবল বাধা এসেছিল বোম্বাইয়ের শিল্পী মহল থেকে। তাঁদের আবেদন-নিবেদন গিয়ে পৌঁছেছিল বড়লাট লর্ড উইলিংডন পর্যন্ত। ফলে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটি বাদ দিয়ে নাম রাখা হয় 'অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এ সংস্থার প্রথম সভাপতি। জয়েন্ট অনারারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি জন ভ্যান ম্যানেন আর অতুল বসু।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অ্যাকাডেমির প্রথম সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন গভর্ন'র স্যার জন অ্যাণ্ডারসন। এ প্রদর্শনীর প্রস্তুতির কৃতিত্ব অতুল বসুর। বোম্বাই, দিল্লি, দার্জিলিং পরিভ্রমণ করে বহু খ্যাতনামা শিল্পী ও ভাস্করের ললিতকলা চর্চার নিদর্শন অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয় তাঁরই চেষ্টায়।

অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার এক দশকের কিছু বেশি পরে অতুল বসুর শিক্ষাব্রতীর জীবন শুরু হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত

হন। কিন্তু অভিলষিত এ পদে তাঁর দীর্ঘদিন থাকা হয়নি। ১৯৪৮-এ তাঁর অধ্যক্ষতার অবসান।

৯

অতুল বসুর বণ্ডেল রোডের বাড়িতে আমার যাতায়াত অনেকদিন থেকে। যার আকর্ষণে শাহীদ সুরাবর্দী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও লিওসে এমারসনের বণ্ডেল রোডের বাড়িতে যাতায়াত আমার আকর্ষণও ছিল তাই। — শিল্পীর স্মৃতির দরজার কুলুপ খোলা। যদি খোলেন তবে উৎকর্ণ হয়ে শুনব তাঁর জীবনকাহিনী। ধীরে ধীরে তিনি খুলেও দিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতির সংগ্রহশালা।

প্রবীণ শিল্পীকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর সহধর্মিণীও —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু, এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শরৎকুমারী দেবীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—দেবযানী বসু।

প্রত্যাশার সবটুকু পাওনা নিয়ে তাই একদিন অতুল বসুর একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। কারণ, তিনি শিল্পী এবং ছবি নিয়েই তাঁর জীবন। কিন্তু তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের যে সন্ধান পেয়েছিলাম তা এত বাঙ্ময় আর বর্ণবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল যে তার যথাযথ চিত্রায়ন দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়েছিল। তাছাড়া তাঁকে জানার চেষ্টা করে দেখেছিলাম এক চলচ্চিত্রও। স্থিরচিত্রের ছবি আঁকা সম্ভব, কিন্তু গতিবেগসম্পন্ন অতুল বসুর জীবনচিত্রের ছবি অসম্ভব। তাই আর তাঁর ছবি আঁকার চেষ্টা করিনি। তাঁর আঁকা ছবি দিয়েই সাজিয়ে দিলাম তাঁর চিত্রকলার কাহিনী।

সংযোজনী : শশিকুমার হেশ

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের উদ্যোগে লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট'-এ শশিকুমার হেশকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্যার জর্জ বার্ডউডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার যে বিবরণ পরের দিন (৭ নভেম্বর ১৮৯৯) লণ্ডনের 'টাইমস' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তা উদ্ধার করা হলো :

"Hindu Artistic Experiences

Under the auspices of the National Indian Association a paper by Mr. Sasikumar Hesh, an Indian artist, describing his artistic experiences on the continent and in England, was read by Dr. Mullick yesterday at the Imperial Institute. Sir G. Birdwood was in the chair. Mr. Hesh narrated how his youthful efforts in a small village in Eastern Bengal attracted the attention of the Zaminder of the district, who offered to defray the expenses of European study. By this means and the munificence and patronage of Maharajah Mymensingh he was enabled, after a course at the Government Art School in Calcutta, to pursue his studies for three years in Rome, Paris and London. In great detail he described the effect produced on his mind by examples of ancient art in the galleries at Rome, Florence, Paris and elsewhere, and how his views widened and his experience deepened with study of modern Italian, French, and German art. Coming last to the Royal Academy exhibition in London he confessed to considerable disappointment. Leaving aside Sargent, Herkomer, Orchardson, Collier, a few portraits by Shannon, and some landscapes, he found little in the exhibition worth notice. The work of John Sargent eame up to his highest expectations, and that painter might fairly take his stand with such masters as Rembrandt and Velasquez. The chief characteristic of modern art was intense realism, and this was a source of danger the reality of which was evident in certain phases of French art. The danger lay in the lack of the ideal, without which the real became meaningless and inane. The ideal of the Greeks was physical perfection and beauty, and with Christian civilization came another influence. But physical beauty was no longer conceded to be the highest ideal, and science had loosened the hold of the supernatural on the human mind. Modern art needed a new ideal, and where was it to be found ? A short discussion followed, and a cordial vote of thanks was passed for the lecture."

তথ্যসূত্র

হেনরি হোভার লক : রচনায় উল্লিখিত সূত্র ছাড়াও Friend of India, Bengal Harkaru, Times of India, Indian Daily News, Hindoo Patriot, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এ নিবন্ধের ভিত্তি। এছাড়া Fine Art Exhibition, Calcutta, Catalouge (1879), 'অন্নদাজীবনী' (১৩১৪) এবং মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' (১৩৩৩) ও 'Centenary: Government College of Art & Craft: Calcutta' গ্রন্থ চারটির সাহায্যও আছে।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী : প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলির সাহায্যেই রচিত হয়েছে এ নিবন্ধ।

হরিশ্চন্দ্র হালদার : প্রবন্ধেই সূত্রসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনতারা হালদারের সংগ্রহে রক্ষিত 'কলাত্রিশী গোত্র : স্বর্গীয় যাদবেন্দু হালদারের বংশাবলী' থেকে হরিশ্চন্দ্র হালদারের পিতার নাম সংগৃহীত হয়েছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত 'বাঙ্গালা নাটক' (১৯৫২) অন্যতম সূত্র গ্রন্থ।

শশিকুমার হেশ : প্রবন্ধ এবং সংযোজনীতে উল্লিখিত সূত্র ছাড়াও Amrita Bazar Patrika, সাহিত্য, Indian Academy of Art, বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিত্র, সংবাদ ও মন্তব্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশ' (প্রদীপ, মাঘ ১৩০৬) এবং অবন্তী দেবী রচিত 'শিবনাথ শাস্ত্রী শশীকুমার হেশ' (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭) প্রবন্ধ দুটিরও সাহায্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'পরিষৎ-পরিচয়' (১৩৪৬) অন্যতম সূত্র গ্রন্থ।

ফণীন্দ্রনাথ বসু : প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলির সঙ্গে নিম্নোক্ত রচনা ও সংবাদসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে, যথা : 'A Bengali Sculptor Trained in Europe The Art of Fanindra Bose' described by St. Nihal Singh, The Graphic, London May 1, 1920; 'একটি বাঙ্গালী ভাস্কর', প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ ; 'দেশ-বিদেশের কথা', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ , 'Bengali Sculptor : Death of Mr. Fanindra Bose,' The Statesman, August 7, 1926; 'Bengali Sculptor: Death of Fanindranath Bose,' The Statesman, August 8, 1926.

প্রমথনাথ মল্লিক ঃ ভাস্করের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে তাঁর জীবনভিত্তিক তথ্যগুলি জানার সুযোগ হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত রচনাগুলির সাহায্যও আছে। যথা ঃ 'The Art of Mr. P. Mullick,' The Illustrated Sisir, June 1924; 'Our New Frontispiece', The Indian Labour Review. February 1929.

অতুল বসু ঃ শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তাঁর জীবনকাহিনী জানার সুযোগ হয়। অন্যান্য সূত্র যথা ঃ 'চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু', প্রবোধ বসু, বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৬ ; 'শিল্পী অতুল বসু', সজনীকান্ত দাস, বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন ১৩৪০ ; Catalogue of the 'Exhibition of Paintings and Drawings by Atul Bose' (with the Foreword by Jamini Roy), December 1939 ; 'The Art of Atul Bose' by Sudhindranath Dutta, The Statesman, May 15, 1949 ; Catalogue of 'A Comprehensive Exhibition of Atul Bose's Drawings and Paintings (1916-66)', September 1967.